অষ্টপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবোপহার।

জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম।
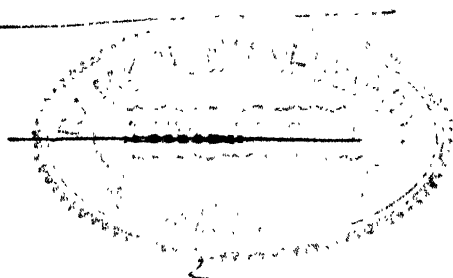
শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।
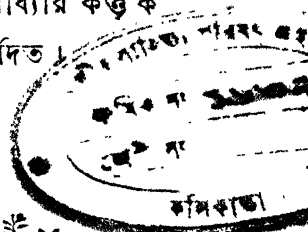
কলিকাতা।
১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রহ্মমিসন্ প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৪। মাঘ

ভূমিকা।

বর্ত্তমানযুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ঈশ্বরের করুণার সাক্ষাৎ নিদর্শন; ব্রাহ্মসমাজ সেই বিধাতার প্রত্যক্ষ লীলাভূমি। ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবন যে প্রেমজলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাস, আমাদের প্রিয় এই ব্রাহ্মসমাজও সেই প্রেমজলধির তরঙ্গোচ্ছ্বাস। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পরমেশ্বরের হস্ত যেমন সাক্ষাৎভাবে তাঁহার জগতে কার্য্য করিত, এই উনবিংশ শতাব্দীতেও যে তাঁহার হস্ত ঠিক্ সেইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্য করিতেছে; তখন যেমন সরল সাধকের প্রাণে পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিতেন, নির্ভরশীল, অনুতপ্ত আত্মাকে স্বর্গীয় শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতেন, এখনও যে সেইরূপ করিয়া থাকেন; তখনকার বিশ্বাসিগণ যেমন অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের মধ্যে তাঁহার জীবনপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ বাণী শ্রবণ করিয়া নবজীবন লাভ করিতেন, বর্ত্তমান যুগের বিশ্বাসিগণের জীবনেও যে ঠিক্ সেইরূপ ঘটনা সম্ভব;— ব্রাহ্মসমাজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা করুণাময়ের এই বিশাল প্রেমাবর্ত্তের স্রোতে আসিয়া পড়িয়াছেন; ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বিশ্বাসচক্ষে ব্রাহ্মসমাজের ঘটনাবলীর মধ্যে সেই বিশ্ববিধাতার হস্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের তাপদগ্ধ প্রাণ শীতল করিবেন, তাঁহা-

দের ক্ষীণ প্রাণে দুর্জ্জয় ব্রহ্মশক্তি সঞ্চারিত করিবেন, তাঁহাদের জীবনে অলৌকিক ব্যাপার সকল সংঘটিত করিবেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকস্থিত প্রবন্ধের লেখকগণকেও করুণাময় করুণা করিয়া তাঁহার এই জীবন্ত বিধানের আশ্রয়ে আনিয়াছেন। প্রভুর প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদেরও কিছু করিবার আছে। ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। যাঁহার জগতে একটী ক্ষুদ্র কীটাণুও বৃথা সৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার লীলাভূমিতে তিনি যাঁহাদিগকে আনিয়াছেন তাঁহাদের জীবনদ্বারা কি অতি সামান্য পরিমাণেও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা হইবে না? ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত অন্যান্য ভাই ভগ্নীর ন্যায় তাঁহাদের ক্ষুদ্র প্রাণেও ত সেই ঈশ্বরেরই শক্তি কার্য্য করিতেছে? তবে তাঁহাদের যাহা দিবার আছে তাহা দিবেন না কেন?

তাই তাঁহাদের প্রাণের কয়েকটী ভাব, সযত্নে পোষিত কয়েকটী সত্যরত্ন ভাষাসূত্রে গ্রথিত করিয়া ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগ্নীর করে অর্পিত হইল। ইহাদ্বারা যদি তাঁহাদের একজনেরও হৃদয় কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করে, তাহা হইলেই তাঁহারা আপনাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

গত বৎসর "তত্ত্বকৌমুদী"তে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে কিছু সত্য আছে তাহা ঈশ্বরের, যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদ থাকে তাহা লেখকদিগের।

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

---

* শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত

† শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ,, ,,

‡ শ্রীসীতানাথ দত্ত ,, ,,

যাহাতে দুইটী চিহ্ন আছে তাহার কিয়দংশ একজনের ও কিয়দংশ আর একজনের লিখিত।

জীবন্ত ও মৃত ধৰ্ম্ম।

আমরা কোথায় যাইতেছি?

অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন, এতদিনের পর এ আবার কি কথা? যাঁহারা এতকাল ধরিয়া সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি আজি ভাবিতে বসিতে হইবে, তাঁহাদের গন্তব্য স্থান কোথায়? আমাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য কি তাহা যে কোন ব্রাহ্ম জানেন না, আমরা এরূপ কথা বলিতে সাহস করি না। যাঁহারা অতি অল্প দিন হইল ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাও আবশ্যক হইলে এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারেন। প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত যাঁহাদের বড় একটা সম্পর্ক নাই, তাঁহাদিগের মুখেও ধর্ম্মের অনেক উচ্চ উচ্চ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আর কিছু হউক আর না হউক, আমরা যে অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছি তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের জীবন যেরূপই হউক না কেন, সাধন ভজন বা প্রেমভক্তির কথায় আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে এরূপ লোক বড় দুষ্প্রাপ্য।

আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা মনে করি বা মুখে বলি, বাস্তবিক আমরা সেই দিকে চলিয়াছি কি না, ইহাই

আমাদের জিজ্ঞাস্য। 'ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য কি?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যত সহজ, 'আমরা সেই লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি কি না?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। পরের কথা শুনিয়া বা পাঠ করিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটীর উত্তর দিতে হইলে গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় প্রশ্নটী বড় গুরুতর। ইহার প্রকৃত উত্তরের অপর আমাদের নিজের ও সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এই জন্য প্রত্যহ না হউক অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে আত্মার নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক সরলভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।

আমরা কোথায় চলিয়াছি? আমরা কি আমাদের লক্ষ্যের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইতেছি,—না লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়াছি? আমরা কি দিন দিন ধর্ম্মজীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছি, অথবা বহুদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এবং যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া, ঘোর আধ্যাত্মিক নিদ্রায় মগ্ন হইতেছি? আমাদের ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের হৃদয়স্থিত আদর্শ পরিবারের অনুরূপ হইতেছে? আমরা যে ভাবে চলিয়াছি তাহাতে কি আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব? আমাদের বিবেচনায় কথাগুলি বড় গুরুতর। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। যাঁহারা হুজুগে পড়িয়া অথবা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন, কিন্তু পরে কোন কারণে ইহার প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা যে এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কল্যাণপ্রার্থী, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে আপনার ও অপরের পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা ধর্ম্মপথে দিন দিন অগ্রসর হইতে চাহেন, ঈশ্বর লাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিক ব্যাকুল, তাঁহারা কখনই এই সকল কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

আমরা কি চাই ? আমরা চাই ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান হইতে, চাই ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে, চাই আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে, চাই জ্ঞান প্রেম পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে, চাই জগতে প্রেম, পুণ্য, শান্তি বিস্তার করিতে, চাই নরনারীকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিতে। আমরা বাস্তবিক প্রাণের সহিত এই সকল চাই আর না চাই, অন্ততঃ মুখে বলি যে আমরা ইহা চাই। ইহাই যে ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য তাহা বোধ হয় কথায় কোনও ব্রাহ্ম অস্বীকার করেন না। কিন্তু যাহাতে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় আমরা কি তাহার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে চেষ্টা করিতেছি ? আমরা কি এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিয়াছি ? ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে যথার্থ ঈশ্বরের গৃহ হয়, প্রেমপুণ্য শান্তির আলয় হয়, আমরা কি বাস্তবিক তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছি ?

যদি তাহা করিতাম, তাহা হইলে কি আজি এ কথা শুনিতে হইত যে 'ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া শান্তি পাওয়া যায় না,

প্রাণের গভীর পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না ?' তাহা হইলে আজি বহু দিনের পুরাতন ব্রাহ্ম এই বলিয়া ক্ষোভ করিবেন কেন যে, 'ব্রাহ্মসমাজে যে আশা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইল না—ব্রাহ্মসমাজে যে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব এক সময়ে দেখিয়াছিলাম তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে' ? তাহা হইলে আজি এত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাধন অবলম্বন করিবে কেন ?

আজি কালি যে দিকে চাই সবই কেমন শুষ্ক শুষ্ক বোধ হয়। ভাই ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহাদের মুখ শুষ্ক, মলিন ; কথা কর্কশ বা মৌখিক নিষ্ঠতার আবরণে আবৃত ; ব্যবহার উদাসীনের মত, অথবা বাহিক সভ্যতার আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ; যে যার নিজের নিজের বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, কেহ যেন কাহারও নয়, কাহারও প্রাণে একটু প্রেম আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই কি সেই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ,—এই কি সেই প্রেমশান্তির আলয়, যাহার জন্য পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহাদের প্রাণে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়া চলিয়া আসিলাম ? হায় ! হায় ! এ যে দেখি উত্তপ্ত বালুকা স্তূপ হইতে অগ্নিকুণ্ডে আসিয়া পড়িলাম ! এক একবার মনে হয় ভাই ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমরা এমন হইলে কেন ?' কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা আপনার আপনার অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট আছেন। তাঁহারা হয়ত আমার কথার উত্তর দেওয়াই আবশ্যক বিবেচনা করিবেন না। এতদিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া তাঁহারা যথেষ্ট

সাধুতা ও ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া এক্ষণে বিশ্রামসুখ লাভ করিতে-ছেন। ধর্ম্ম জিনিষটা যে কি, তাহা তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া এক্ষণে তাহা নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কিছু ভাবিবার বা করিবার নাই। কেহ কেহ হয়ত মুখে স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, ব্রাহ্মজীবনের প্রকৃত আদর্শের দিকে আমরা যাইতে পারিতেছি না। কিন্তু তাঁহারা নানা কার্য্যে বড় ব্যস্ত; আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা উন্নত করিবার জন্য কি করা উচিত তাহা ভাবিবার সময় তাঁহাদের নাই। কদাচ কোথাও দুই একটী পিপাসু আত্মা হয়ত আপনাদের ও সমাজের দুরবস্থা ভাবিয়া নিভৃতে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ লোক সংখ্যায় কয়জন ?

অনেকদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়াছি, আমাদের এমন দশা হইল কেন ? সকলেই ত প্রায় নির্জ্জনে নিয়মিত উপাসনা করেন, সপ্তাহান্তে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেন, উৎসবের সময় সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হন, একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। অনুষ্ঠানের ত্রুটি ত কিছুই নাই, তবে আমরা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না কেন ? জীবন্ত পরমেশ্বরের উপাসক হইয়াও আমরা এমন নির্জ্জীব কেন ? প্রেমময়ের উপাসক হইয়াও আমরা এমন অপ্রেমিক কেন ? রসস্বরূপের উপাসক হইয়াও আমরা এমন শুষ্ক কেন ?

এ কথা বলিলে চলিবে না যে শান্তি বা সুখ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। আনন্দ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য না হইতে পারে,

শান্তি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য না হইতে পারে, সরস ভাব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য না হইতে পারে, কিন্তু আনন্দ, শান্তি ও সরসভাব যে ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান লক্ষণ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আনন্দময়ের উপাসনা করিলে অথচ তোমার প্রাণের নিরানন্দ বিদূরিত হইল না; রসস্বরূপের নিকট বসিলে অথচ তোমার প্রাণ সরস হইল না; প্রেমময়ের প্রেমমুখ দেখিলে অথচ তোমার প্রাণ বিগলিত হইল না, মানুষকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে পারিলে না; পবিত্র স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিলে অথচ তোমার প্রাণ পবিত্র হইল না, তাঁহার সৌন্দর্য্যে তোমার প্রাণ আকৃষ্ট হইল না; জীবন্ত পরমেশ্বরের সংস্পর্শে আসিলে, অথচ তোমার প্রাণ জাগিল না, প্রাণের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ ছুটিল না, প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইল না; তুমি যেমন নির্জ্জীব, যেমন অসাড়, যেমন মৃত, তেমনি রহিলে;—ইহা হইতেই পারে না। হয় স্বীকার কর তোমার প্রকৃত উপাসনা হয় নাই, তুমি প্রেমময়ের দর্শন পাও নাই, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে স্পর্শ করেন নাই, নতুবা তোমার ব্যবহার দ্বারা, কার্য্য দ্বারা, জীবন দ্বারা দেখাও যে তোমার প্রাণের মধ্যে ঈশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর প্রেম-প্রস্রবণের নিকট বসিয়াও যদি তোমার প্রাণের শুষ্কতা বিদূরিত না হয়, তবে জানিও তোমার উপাসনা ঠিক্ হইতেছে না। তুমি যদি বল, 'আমি নিত্য ঈশ্বরের উপাসনা করি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণ ভিজে না', তাহা হইলে হয় তুমি মিথ্যাবাদী, নতুবা কল্পনার উপাসক। উপাসনার উদ্দেশ্য শান্তি

বা আনন্দ নহে, কিন্তু আনন্দ শান্তি যে প্রকৃত উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

নিজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রাণটা এমনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কিছুতেই চাগে না। উপদেশই শুনি, আর ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থই পাঠ করি, আর সাধু সঙ্গেই থাকি, সবই যেন প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। শুষ্ক প্রাণ কিছুতেই সরস হয় না, পাষাণ হৃদয় কিছুতেই গলে না। এমন যে ঈশ্বরোপাসনা তাহাতেও দেখি মন ভিজে না, প্রাণে শান্তি পাই না, প্রাণের নির্জ্জীবতা দূর হয় না। এমন একদিন ত ছিল যখন আমার মনের ভাব অন্যরূপ ছিল। তখন ধর্ম্মের কথা শুনিয়া প্রাণত উদাসীন থাকিত না, ঈশ্বরোপাসনার পর প্রাণ নীরস, অতৃপ্ত ও নির্জ্জীব থাকিত না। এখনই বা অন্য ভাব দেখি কেন ? পরমেশ্বরের প্রকৃতি ত অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও ত তেমনি আছেন। তিনি ত চিরদিনই নিকট হইতে নিকটতর। তিনি তখনও যেমন জীবন্ত ও প্রেমময় ছিলেন, এখনও ত তেমনি আছেন। তবে পরিবর্ত্তন কোথায় ? পরিবর্ত্তন আমাতে। আমি তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাই না। আমি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি না। এক কথায় আমার প্রকৃত উপাসনা হয় না। *

হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতে না পাইলে ধর্ম্ম সাধনই বল, সৎকার্য্যই বল, সাধুতাই বল, সকলই বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিয়া শাখায় জল সিঞ্চনের ন্যায় নিষ্ফল। ঈশ্বরদর্শন, তাঁহার

সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ যত দূর সম্ভব উজ্জলভাবে উপলব্ধি করা—ইহাই ধর্ম্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা এই লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া বহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াছি বলিয়া মনে করি আমরা ধর্ম্মপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি; আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সৎকার্য্য করিতে গিয়া নিজের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি; আমরা নিজের দোষে তাঁহার ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান আনয়ন করিয়া আপনাদের চরণে আপনারা কুঠারাঘাত করিতেছি; আপনাদের শৃঙ্খলে আপনারা বদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই ব্যবধান দূর না হইলে, এই শৃঙ্খল ভগ্ন না হইলে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইব কিরূপে? আর তাঁহার প্রকাশ ভিন্ন এই নির্জ্জীবতা এই শুষ্কতা, এই সকল বহুদিনের সঞ্চিত পাপ দূর হইবেই বা কিরূপে? ঈশ্বরের স্বরূপ উজ্জলভাবে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি না করিলে কিছুতেই আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না।

ঐ শুন আজি ব্রাহ্মসমাজের এই ঘোর শুষ্কতার দিনে, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের হৃদয়দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তোমরা কোথায় যাইতেছ?' ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনি, একবার বিরলে বসিয়া ভাবিয়া দেখিবে কি—

আমরা কোথায় যাইতেছি?

জীবন্ত ধর্ম্মের লক্ষণ।

ঋণ করিয়া ধনী হওয়া যায় না। ঋণলব্ধ বস্তুকে নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করা অপেক্ষা মূঢ়তা আর কি হইতে পারে? পরের অট্টালিকায় বাস করিয়া, পরের অর্থে সুখসেব্য নানাবিধ দ্রব্য আহার করা অপেক্ষা নিজের পর্ণকুটীরে বসিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে শাকান্ন ভোজন করাও যে সহস্র গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষ কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। পরের ধনে বড়মানুষী দেখান রোগটা অনেকেরই আছে। ঋণ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঋণের উপর নির্ভর করিয়া চিরদিন কোনও কারবার চলে না। পরের স্কন্ধে ভর করিয়া চিরদিন দাঁড়াইয়া থাকা যায় না।

জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। অনেকে কেবল বহুল পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। কিন্তু পুস্তকগত বিদ্যা কার্য্যকালে কোন উপকারেই আসে না। নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তির গৃহেও প্রকাণ্ড পুস্তকালয় থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তাহাকে জ্ঞানী বলিবে না। সেইরূপ যিনি পুস্তকস্থ বিষয় পাঠ বা অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। তাঁহাকে বিদ্বান্ বল, পণ্ডিত বল, কিন্তু জ্ঞানী বলিও না। প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি নিরক্ষর হইলেও জ্ঞানী আর যিনি চিন্তাহীন, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও তিনি কেবল গতি ও বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট পুস্তকালয় বিশেষ। পুস্তক-

লব্ধ বিদ্যার যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে। কিন্তু সে প্রয়োজন কেবল চিন্তাশক্তিকে সাহায্য করা মাত্র।

আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ঐ কথা। এখানেও অনেকে অপরের পরিচ্ছদ পরিয়া ধার্ম্মিক সাজিতে যান; অপরের উপার্জ্জিত সত্যরত্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেক সময় তাহা নিজস্ব মনে করিয়া আত্মপ্রতারিত হন। কিন্তু ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা শুনিলে বা কণ্ঠস্থ করিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। নিজের উপার্জ্জিত একটী সামান্য সত্য অপরের মুখলব্ধ সহস্র উচ্চ সত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম যে পরিমাণে আমার নিজস্ব হইয়াছে, সেই পরিমাণে উহা আমার পক্ষে সজীব। অপরের উপার্জ্জিত সত্য যতদিন না আমি নিজের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করি, তত দিন উহা আমার পক্ষে মৃত। অপরের প্রচারিত সত্য যে পরিমাণে আমার চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত ও পরিচালিত করে, আমাকে সত্যলাভের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, সেই পরিমাণে উহা আমার পক্ষে প্রয়োজনীয়। নতুবা আমার জীবনে উহার কোন কার্য্যকারিতা নাই। উহা আমার উন্নতির ভিত্তিভূমি হইতে পারে না।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক অধীনতার দিন ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। অভ্রান্ত আপ্তবাক্যের উপর, মহাজনপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মকাণ্ডের উপর লোকের আস্থা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। পরের মুখের কথায় এখন আর চিন্তাশীল লোকের মন তৃপ্তি মানিতে চাহে না। সে কালের

লোকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন, প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতেন। একালেই বা তাহা হইবে না কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা কি এখন তাঁহার জগতে কার্য্য করিতেছে, না? তাঁহার সৃষ্টির সহিত কি তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে? সেকালে যাহা সম্ভব ছিল একালে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? সে কালে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, একালে তাহার প্রয়োজনীয়তার হ্রাস হইবে কেন? পূর্ব্বে যেমন ঈশ্বর দর্শনের প্রয়োজন ছিল, প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরবাণীশ্রবণের প্রয়োজন ছিল, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়োজন ছিল, এখনও তেমনি আছে। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই স্বর্গরাজ্যের সোপান। ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, অন্য পথ নাই। ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। আর যাহা কিছু তাহা ইহার সাধন মাত্র, সহায় মাত্র। তোমার ঈশ্বরকে লইয়া আমি কি করিব? তুমি ঈশ্বরবাণী শুনিয়াছ, তাহাতে আমার কি? তুমি তাঁহাকে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, প্রভু বলিয়া, গুরু বলিয়া, রাজা বলিয়া, পরিত্রাতা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছ, তাহাতে আমার কি? আমার প্রাণেশ্বরকে আমি দেখিতে চাই, আমার হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাক্য শুনিতে চাই, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাই। আমার প্রাণের অনন্তপিপাসা আর কিছুতেই মিটিবার নয়। মানুষের কথায় আমার প্রাণ ভিজে না। মানুষের উপদেশ আমার প্রাণের অন্তস্তল স্পর্শ করে না। আমার প্রাণেশ্বরের সহিত আমি প্রত্যক্ষ ও নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে চাই। ইহাই পরিত্রাণ, ইহাই স্বর্গ।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করাই ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্ম দ্বারা ইহা সংসাধিত হয় তাহাই জীবন্ত ধর্ম্ম। যে উপদেষ্টা ইহার সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারক।

এই যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ, ইহা সংস্থাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন প্রকার অভ্রান্ত আপ্তবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কাহাকেও ব্যবধান বা মধ্য-বর্ত্তিরূপে স্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহার মতে গুরূপদেশের যদি কিছু উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধস্থাপন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যে উপদেষ্টা আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া অপরকে এই প্রত্যক্ষ স্বর্গীয় যোগের পন্থা দেখাইয়া দেন, তিনিই মানব সমাজের যথার্থ উপকারী বন্ধু। আর যিনি ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে আপনাকে ব্যবধানরূপে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করেন, তিনি মানবাত্মার পরম শত্রু। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যেরই ঈশ্বরের নিকট যাইবার, তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে দেখিবার, তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবার অধিকার আছে,—কেবল যে অধিকার আছে তাহা নহে—প্রত্যেক মনুষ্যকে ইহা করিতেই হইবে, নতুবা পরিত্রাণ নাই। পরমেশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন, প্রাণের মধ্যে তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী বাণী শ্রবণ, তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ সকল মনুষ্যের পক্ষেই সম্ভব, এবং ইহা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই।

আমরা কিন্তু এমনই নির্ব্বোধ যে, এরূপ মহোচ্চ সত্য লাভ করিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি! এমন জীবন্ত ধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াও আমরা অসাড় ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা যদি জীবন্ত ধর্ম্ম সাধন করিতাম, পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আজি আমাদের জীবনের গতি অন্যরূপ হইত। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমরা অনেকেই ব্রাহ্মনামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যিনি প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার আবার ব্রাহ্মনামে অধিকার কি? আমি যদি আমার ইষ্টদেবতার দর্শনই না পাইলাম, তাঁহাকে যদি আমার ঈশ্বর বলিয়া বিশেষ ভাবে ধরিতে না পারিলাম, তবে আর আমার কিসের ধর্ম্ম? ধর্ম্ম যদি পোষাকি জিনিস হয়, ধর্ম্ম যদি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যকে নিয়মিত না করে, ধর্ম্ম যদি প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত না করে, তবে তাহাকে অন্য যে নাম দিতে হয় দিও, কিন্তু ধর্ম্মনামে অভিহিত করিও না।

আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও লঘুত্ব।

লঘু গুরুর বিচার বাহ্যজগতে যেরূপ, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। ফুৎকারে তৃণ আকাশে উত্থিত হয়, কিন্তু লৌহ-গোলক বলে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলেও ভূতলে পড়িয়া যায়। বেলুন উপরে উঠে কেন? পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা বেলুনস্থিত বাষ্পের ভার

অল্প বলিয়া। এই গুরুত্ব ও লঘুত্ব আয়তন ও পরমাণুসন্নিবেশ-সাপেক্ষ। পরমাণু সন্নিবেশ একরূপ হইলে, আয়তন অনুসারে ভার নির্দ্দিষ্ট হয়, আবার আয়তন এক হইলে পরমাণুসন্নিবেশের ঘনত্ব ও বিরলত্ব অনুসারে ভারের তারতম্য হইয়া থাকে। আত্মার গুরুত্ব ও লঘুত্বেরও এইরূপ প্রভেদ করা যাইতে পারে। আত্মা সারবান্ হইলেই চঞ্চলতার হস্ত হইতে রক্ষা পায়; অসার আত্মা "বায়ু-উৎক্ষিপ্ত তুষের ন্যায়"। বায়ু উঠিলে তাহার আর নিস্তার নাই। বাহ্যজগতের ন্যায় গুরুত্ব এখানেও আয়তন ও পরমাণু-সন্নিবেশসাপেক্ষ। আত্মার গুণ সমষ্টি উহার আয়তন; গুণের পরিমাণ ও সংখ্যা অনুসারে উহার বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। বৃহদায়তন আত্মাকেই অনেক সময়ে স্থিতিশীল হইতে দেখা যায়। আবার আয়তন এক হইলে পরমাণু-সন্নিবেশ অনুসারে আত্মার গুরুত্ব ও লঘুত্বের ইতরবিশেষ হয়। যে আত্মা জলের মত, যাহার ভাব ও জ্ঞান-পরমাণু বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল, সে আত্মার পদে পদে বিপদ্, সে আত্মার মূল্য অতি সামান্য; আর যে আত্মার ভাব ও জ্ঞান-পরমাণুর জমাট আছে, প্রলোভন ঝটিকায় সহজে তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক অশনিপাত সে অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে।

ভাই, তুমি এখন দাঁড়াইয়া আছ বলিয়া মনে করিও না যে, তোমার শত্রু তোমার পায়ের নীচে প্রাণবিনাশকারী সুরঙ্গ খনন করিবে না। আত্মাকে ওজন করিয়া দেখ, আত্মা ভারি কি হাল্কা, আত্মার গাঁথনি জমাট কি পাতলা। আত্মা যদি ভারি ও উহার গাঁথনি যদি জমাট না হইয়া থাকে,

তবে নিশ্চয় জানিও অধিক দিন দাঁড়াইতে পারিবে না। পরীক্ষার মহাবীজন হাতে করিয়া প্রভু সম্মুখে উপস্থিত। সকলেই সশঙ্ক, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেছেন, কে যাইবে, কে থাকিবে, কিছুই নিশ্চয় নাই। দশ বৎসর ধরিয়া একজন লোক সাধন করিতেছিল, বীজনের একবার মাত্র সঞ্চালনে সে যে কোথায় উড়িয়া গেল কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। তোমার আমার দশা কি হইবে? যদি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি, তবেই প্রভু মনোনীত করিয়া স্বর্গীয় সাধকের পদে অভিষিক্ত করিবেন, কিন্তু লঘু আত্মা লইয়া কিরূপে দাঁড়াইয়া থাকিব? পালক ও সোলার মত হাল্কা হইয়াও মনে মনে কল্পনা করিতেছি যে, আমি স্থির থাকিতে পারিব। তাই বলি সাবধান, সম্মুখে মহাবিপদ, এখন আর অলস হইয়া থাকিলে চলিবে না।

যদি দাঁড়াইয়া থাকিতে চাও, আত্মার লঘুত্ব ঘুচাইতে চাও, পরীক্ষা ঝটিকায় অচল প্রায় অটল হইয়া থাকিতে চাও, তবে কায়মনোবাক্যে উপাসনা সাধন কর। সেই পুরাতন উপাসনার কথা বলিতেছি, যাহার কথা এতদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। কথাই কিন্তু পুরাতন, জিনিস পুরাতন হয় নাই, হইতে পারে না। উপাসনা করিতে বসি কিন্তু উপাসনান্তে কি দেখিতে পাই যে আত্মার ওজনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পূর্ব্বাপেক্ষা আত্মা গুরুতর হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত উপাসনা হইয়াছে কিরূপে বলিতে পার? ব্রহ্মরাজ্যে যদি বেড়াইতে গিয়াছিলে, তবে নিদর্শনস্বরূপ সে রাজ্যের কি সামগ্রী আনিয়াছ? ব্রহ্মপুষ্পের দলমধ্যে

যদি প্রবেশ করিয়াছিলে, তবে কতটুকু মকরন্দ পান করিতে সমর্থ হইয়াছ? ব্রহ্মসত্তা-সমুদ্রে যদি ডুবিয়াছিলে, তবে অসার পার্থিব আমোদে রত হইয়া আত্মাকে কেন মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছ? শুধু একটু প্রার্থনা করিয়া নিয়ম বজায় রাখিলে উপাসনা হইবে না। উপাসনা প্রাণের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করা চাই। নদীতে স্নান করিতে গিয়া কূলে দাঁড়াইয়া কতক্ষণ মস্তকে জল ঢালিবে? অবগাহন না করিলে, ডুব না দিলে প্রাণ শীতল হইবে কেন?

দ্বিতীয়তঃ, ধ্যান সাধনা করিতে হইবে। ধ্যান সাধনাতে আজি কালি আমাদের বড়ই অমনোযোগ। আমাদের মধ্যে কয়জন লোক ধ্যান করেন? অবকাশ পাইলে ছুটিয়া ধ্যানে বসা আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ধ্যান প্রভুর অস্তিত্ব-সমুদ্রে নামিবার সোপান, সে ধ্যানে আজিকার দিনে সাধকদিগের তত আস্থা নাই। আত্মার পরমাণুব কেন জমাট বাঁধিবে? কৃত্রিম উপায়-সাপেক্ষ কষ্টসাধ্য কল্পনার ধ্যানের কথা বলিতেছি না। সরল মর্ম্মস্পর্শী ও সহজ-সাধ্য যে স্বাভাবিক ধ্যান, তাহা অপেক্ষা প্রকৃততর সত্য পদার্থ জগতে নাই। তাহা দীন দুঃখী ক্ষীণ অনুতপ্ত সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। বৈরাগ্যে আচমন করিয়া এই ধ্যানভোগে বসিতে হয়, স্বয়ং আনন্দময়ী স্বর্গের অন্ন পরিবেশন করেন। সে অন্ন, সে অমৃত গ্রহণ করিলে জীব চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করে। "এই ধ্যান-বারিযোগে ব্রহ্ম-দর্শন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, যে পুষ্পের সৌরভকণিকা লাভের জন্য যুগে যুগে যোগিবৃন্দ কতই ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। ভৃঙ্গের গুন্ গুন্ ধ্বনি

তখনই নিবৃত্ত হয়, যখন সে পুষ্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আত্মার কোলাহলও সেইরূপ তখনই শান্ত হয়, যখন আত্মা পরমাত্মাতে উপবিষ্ট হয় ও পরমাত্মার অস্তিত্বের গভীর দেশে প্রবেশ করে। আত্মার লঘুত্বহারী অশেষ গুণাকর এই ধ্যানে যাহার অবহেলা, প্রলোভন আসিলে তাহার নিদর্শন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। বরং তৃণও একদিন দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু গুরুত্বহীন জীবনের পতন অবশ্যম্ভাবী।

আত্মার গুরুত্ব সাধনের তৃতীয় উপায় মনন। মহাত্মা পল্ বলিয়াছেন—'অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর'। আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষিরাও বলিয়া গিয়াছেন "আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসতব্যঃ"। বার বার চিন্তা করিতে হইবে। ব্রহ্মবস্তু সামান্য নহে যে মনে করিলেই পাওয়া যাইবে। যদি সিদ্ধ হইতে পার তবে ব্রহ্মবস্তু বাস্তাবিকই মনে করিলে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন সিদ্ধ হইতে না পার, ততদিন অবিশ্রান্ত মনন কর। যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই প্রভুর কথা ভাবিবে। কি ছাইভস্ম অসম্বদ্ধ আলাপ করিয়া আমাদের জীবনের কত সময় আমরা নষ্ট করিয়া থাকি। ব্রাহ্ম ভাই, প্রভুকে প্রাণ দিতে ব্যস্ত হইয়াছ, আগে চিন্তা দাও, তবে প্রাণ দিতে পারিবে। মননের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে তবে তাহা এখনি বিসর্জ্জন কর। কিন্তু মনন ভিন্ন উজ্জ্বল আত্মজ্ঞান ও পরিষ্কার ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। মননই মানসিক জীবনের কর্ণধার স্বরূপ। মনন হীন ব্যক্তি ব্যক্তি নহে, বস্তু মাত্র। প্রভু আমাকে অবিশ্রান্ত ভাবিতেছেন, আমি তাঁহাকে দুই এক ঘণ্টা সময় দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব?

তিনি যদি আমাদের প্রিয় হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে "বার বার ফিরে ফিরে ইচ্ছামত নিরখিতে" বাসনা হইবেই হইবে।

ভাই, এস এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করি, দেখিবে অচিরে জীবনে মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, দেখিবে অসার ও অলীক পার্থিব আমোদ ও আসক্তির লঘুতা আর আমাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না; পরীক্ষার তরঙ্গ প্রলোভনের ঝটিকায় মস্তকের একটী কেশও ছিন্ন করিতে পারিবে না; এবং বাহিরের মহা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অন্তরের শান্তি নিয়ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের জীবন।

আদর্শ উচ্চ না হইলে জীবন কখনই উন্নত হইতে পারে না। যাহার আদর্শ যেরূপ, তাহার জীবনও অনেক অংশে তদনুযায়ী হইয়া থাকে। অপরদিকে আদর্শ উচ্চ হইলেই যে জীবন উন্নত হইবে, এমন কোনও কথা নাই। আদর্শে বিশ্বাস থাকা চাই। শুদ্ধ কবিকল্পনায় স্বর্গে যাওয়া যায় না। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া লক্ষমুদ্রার স্বপ্ন দেখিলে ধনী হওয়া যায় না। আমি যে অবস্থাকে আমার জীবনের আদর্শ বলিয়া সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, চেষ্টা করিলেই ঈশ্বরপ্রসাদে আমি সেই অবস্থা পাইতে পারি এবং সেই অবস্থায় উপনীত হওয়াই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র লক্ষ্য, এই বিশ্বাসটুকু তাহার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল থাকা চাই। নতুবা বুদ্ধ, ঈশা বা চৈতন্যের স্থায় উন্নতজীবন কল্পনার তূলিকায় মানসপটে চিত্রিত

করিতে পারিলেই যদি তাঁহাদের মত জীবন লাভ করা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? তাহা হইলে ত যাহার একটু কল্পনাশক্তি প্রবল, সেই স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিত! যাহার আদর্শে বিশ্বাস আছে, সে তাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। যাহার আদর্শে বিশ্বাস নাই, সে মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, সে কখনই তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতে পারিবে না। অপরদিকে যাহার যাহা লক্ষ্য, তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা তাহার মনেই আসে না। যাহার দৃষ্টি ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ, সে কেমন করিয়া মহৎ বিষয় ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? এই জন্যই দেখা যায় যে, আদর্শ উচ্চ না হইলে জীবন উন্নত হয় না। উচ্চ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বিশ্বাসের সহিত সেই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা না করিলে ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রভাব কখনই অতিক্রম করিতে পারা যায় না। একটা উচ্চ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলে জীবনপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিঘ্ন সকল আপনা আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কখনই উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করা যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ যে অত্যন্ত উচ্চ একথা বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেহ অস্বীকার করেন না। আত্মাতে নিত্য ঈশ্বর দর্শন, প্রাণের মধ্যে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ বাণী শ্রবণ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রত্যক্ষ ও নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিজের জীবনে ও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা—মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর লক্ষ্য আর

কি হইতে পারে? কিন্তু এই উচ্চ ও স্বর্গীয় আদর্শ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যখন আমরা আপনাদের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন কি দেখিতে পাই?—তখন দেখিতে পাই যে এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের কিছু মাত্র চেষ্টা নাই, সংগ্রাম নাই। আমরা যে কেবল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া, বাহিরের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি তাহা নহে। সহস্র অপরাধ ও অভাবের মধ্যেও যদি আমাদের উচ্চ আদর্শের কথা মনে হইয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, এবং আমরা মনে মনে অত্যন্ত অতৃপ্তি অনুভব করিতাম, তাহা হইলেও আশা করা যাইতে পারিত যে, একদিন না একদিন আমাদের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, একদিন না একদিন ব্রাহ্মগণ আবার আলস্য ও সাংসারিকতার শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ভীমপরাক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। কিন্তু একটী ভাব দেখিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করিতেছি। ব্রাহ্ম সমাজ যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে দিন দিন অবনতির পথে যাইতেছে, আমরা যে বাহিরের ব্যস্ততা ও আড়ম্বরের মধ্যে পড়িয়া প্রকৃত বস্তু হারাইতে বসিয়াছি, পরমেশ্বর হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি, আমাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে দিন দিন দূরে গিয়া পড়িতেছি, একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই অন্ধতা, এই আধ্যাত্মিক সন্তোষের ভাবই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়া ও

বলিয়া আমাদের মন অসাড় ও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মনে করি আমাদের মত ধার্ম্মিক বুঝি আর জগতে নাই; আমরা যেমন উন্নত হইয়াছি, এমন উন্নত বুঝি আর কেহ কখন হয় নাই, হইতে পারে না; আমাদের জীবন ত বেশ চলিতেছে; ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জানিবার, শিখিবার বা করিবার আর কিছু নাই; আমরা একেবারে স্বর্গরাজ্যের চাবি পাইয়াছি—দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিলেই হয়।

এই আধ্যাত্মিক সন্তোষের কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমাকে যদি কেহ ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণের জীবনের উচ্চ ভাব সমূহের সমাঞ্জস্য করিয়া এমন একটী সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চিত্র কল্পনার সাহায্যে চিত্রিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতে পারিব যে, তিনি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন, এবং মনে করিবেন,—'ওঃ। এই লোকটার জীবন না জানি কত উন্নত!' কিন্তু আমার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তিনি যদি দেখিতে পারিতেন বাস্তবিক ঐ আদর্শে আমার বিশ্বাস আছে কি না, ঐ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আমি উহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি কি না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে কপট অথবা অসার কল্পনার সেবক বলিয়া ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার সহিত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। না—ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে আমাদের বিশ্বাস

নাই। আমরা মুখে যাহাই বলিনা কেন আমরা বাস্তবিক বিশ্বাস করি না যে আত্মার মধ্যে নিরাকার পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়, তাঁহার জীবনপ্রদ বাণী শ্রবণ করা যায়; আমরা বিশ্বাস করি না যে মানুষ—ক্ষুদ্র, পাপী, দুর্ব্বল মানুষ—সেই অনাদি অনন্ত, পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ে বসাইয়া তাঁহাকে 'আমার ইষ্ট দেবতা', 'আমার পিতামাতা', 'আমার বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে; আমরা বিশ্বাস করি না যে ইহজীবনে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন করা যাইতে পারে; আমরা বিশ্বাস করি না যে মানুষের জীবনে এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন সে ঐশ্বরিক ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। যদি সে বিশ্বাস আমাদের থাকিত তাহা হইলে আজি আমরা কখনই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে উন্নতির চরমসীমা মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি সে বিশ্বাস আমাদের থাকিত তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বোক্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া কখনই থাকিতে পারিতাম না। যাহার যে বিষয়ের জন্য ব্যাকুলতা নাই সে তাহা পাইবার নিমিত্ত প্রাণ খুলিয়া চেষ্টা করিবে কেন? আর যাহার বিশ্বাস নাই তাহার ব্যাকুলতা আসিবে কোথা হইতে? নতুবা ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা, সামান্য আশার কথা যে, পবিত্র স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বর্গের দেবতা পাপী মনুষ্যের হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, তাহার

সহিত কথা কহেন, তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাকে আপনার শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করেন, তাহার হাত ধরিয়া পরিত্রাণের পথে লইয়া যান, তাহাকে ইহ জীবনেই স্বর্গের শোভা দেখাইয়া মোহিত করেন? একি সামান্য ব্যাপার?—ইহার তাৎপর্য্য যে উপলব্ধি করিয়াছে, ইহা সত্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে কি ঘুমাইয়া থাকিতে পারে? সে কি মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে পারে? সে কি পরমেশ্বরকে দেখিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে? তাহার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার হইবে না? তাহার শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ ছুটিবে না? তাহার কথায় পাপাসক্ত প্রাণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? অবিশ্বাসীর প্রাণের অন্ধকার বিদূরিত হইবে না? কপটী নাস্তিকের হৃদয় স্তম্ভিত হইবে না?—তবে আর বিশ্বাস কিসের? কাতরপ্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর দেখা দেন, এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলে কি আর ঈশ্বরের দর্শনলাভ করিতে বিলম্ব হয়, না পুরাতন পাপের জন্য চিরদিন ধরিয়া আক্ষেপ করিতে হয়? আসল কথা এই যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস করি না—অন্ততঃ ইহ জীবনে আমরা উহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব বলিয়া মনে করি না। তাহা যদি করিতাম তাহা হইলে আজি আমাদের জীবনের গতি অন্যরূপ হইত।

আপনার সহিত বিবাদ করিয়া মানুষ কতদিন থাকিতে পারে? পদে পদে বিবেকের তিরস্কার সহ্য করিয়া চলিতে হইলে জীবন ভারবহ হইয়া পড়ে। চিরদিনই আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। কাজেই

মানুষ যখন বিবেকের প্রদর্শিত পথে চলিতে না পারে, তখন সে বিবেককে কোনও মতে বুঝাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ খুব উচ্চ বটে, কিন্তু আমাদের সেই আদর্শে বিশ্বাস নাই; আমরা যে চেষ্টা করিলে ঈশ্বরপ্রসাদে সেই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, তাহা বিশ্বাস করি না। আমরা মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অস্বীকার করি না, অথচ কার্য্যতঃ সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমা-দের অণুমাত্র চেষ্টা নাই। কাজেই বিবেককে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই। সেই জন্য আমরা মনে মনে আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে একটু খাট করিয়া লইবার চেষ্টায় আছি। আমরা বিবেককে এই বলিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ আমাদের বর্ত্তমান জীবনের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চ; 'ঈশ্বরদর্শন,' 'আত্ম-সমর্পণ' এসকল সপ্তমস্বর্গের কথা; বিশেষধর্ম্মভাবসম্পন্ন দুই চারিজন লোক সেই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের মত সাংসারিক লোকের পক্ষে সে আশা বৃথা; আমাদের মত লোকের পক্ষে প্রতিদিন এক আধবার চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বরের নিকট বসিতে চেষ্টা করা, উৎসবাদি বিশেষ ঘটনায় একটু ভাবের উচ্ছ্বাস উপভোগ করা, আর কোনও মতে চরিত্রটা ভাল রাখিয়া ভাই ভগ্নীর একটু আধটু উপকার করা এবং সামাজিক কুপ্রথা সকল বিদূরিত করিতে সাধ্যমত যত্ন করা—এই হইলেই যথেষ্ট হইল। মুখে সকলে স্পষ্টতঃ এরূপ ভাষা ব্যবহার করুন

আর না করুন, আমাদের মধ্যে অনেকেই যে আমাদের জীবনের আদর্শকে এইরূপ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের আদর্শকেও অবনত করিয়া ফেলিতেছি। এরূপ স্থলে আমরা যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ সন্তুষ্টভাবে কাল যাপন করিব তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহার গন্তব্য স্থান অধিক দূরবর্ত্তী নহে, তিনি অল্প পথ চলিয়াই মনে করেন, 'আমি অনেক দূর আসিয়াছি।' গণ্ডশৈলের শিখর-দেশে আরোহণ করা যাঁহার লক্ষ্য তিনি অল্পক্ষণ চলিবার পরই দেখেন যে তাঁহার গম্যস্থান অতি নিকটে, কিন্তু যিনি হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়ায় আরোহণ করিতে চান, তিনি যতই উঠেন ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গ সকল তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হইতে থাকে, এবং তিনি কখনই অল্পদূর উঠিয়া—'যথেষ্ট হইয়াছে' মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেইরূপ যাঁহার আদর্শ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ তিনি অল্প উন্নতিতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কালযাপন করেন, কিন্তু যাঁহার আদর্শ উচ্চ তিনি যতই উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে। কাজেই তিনি নিজের অবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

আমরা যে উপাসনা করি না তাহা নহে, আমরা যে সৎকার্য্য করি না তাহা নহে, আমাদের যে চরিত্র একেবারে জঘন্য ও হেয় হইয়া পড়িয়াছে তাহাও নহে। আমাদের

সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। আমাদের উপাসনা আছে, কিন্তু উপাসনার তেমন গভীরতা নাই। পরোপকার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সাধুকার্য্যে আমাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু আমাদের সৎকার্য্যের মধ্যে তেমন প্রেম নাই, সেবার ভাব নাই। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার চেষ্টা আছে—কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবার দিকে লক্ষ্য নাই। আমরা ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতে বসিয়াছি, অথচ আপনাদের প্রাণে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই! আমরা চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, অথচ আপনাদের জীবনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আমরা তেমন ব্যাকুল নহি! আমরা উপাসনা ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছি, আমরা প্রকৃত সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ খাট করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি মনে করেন যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শকে এইরূপে খর্ব্ব করিয়া তদ্দ্বারা জগতের পরিত্রাণ সাধন করিবেন, তাঁহার ন্যায় নির্ব্বোধ ও বাতুল সংসারে নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ অচিরে আমাদের দেশের অন্যান্য নির্জ্জীব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পাড়বে। যিনি ঐ উচ্চ আদর্শকে রেখামাত্র অবনত করিতে চান, তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের শত্রু, তিনি সমস্ত মানবজাতির শত্রু। নিয়ম রক্ষার মত একটু আধটু উপাসনা, উৎসবের সময় একটু সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস, চলনসই সাধুতা, আর দুই পাঁচটি শুষ্ক সৎ-

কার্য্যের বাহ্য আড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত থাকা—এই কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ? এই কি উন্নতির চরম সীমা? এই লইয়া কি আমরা বিবেকের নিকট, ঈশ্বরের নিকট খাটি হইতে পারিব? যদি ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়, যদি ইহাই জীবনের লক্ষ্যস্থান হয়, যদি ইহাই মানবাত্মার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে চাই না সে ব্রাহ্মধর্ম্ম, চাই না সে লক্ষ্যস্থান, চাই না সে উন্নতি। প্রাণেশ্বরকে প্রাণের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে দেখা, তাঁহার পরি-ত্রাণপ্রদ বাণী শ্রবণ করা, তাঁহার সহিত প্রাণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা, তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা ও নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা ভিন্ন যদি ধর্ম্ম বলিয়া বাহিরের আর একটা কিছু জিনিস থাকে, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া আমার কি হইবে, জগতেরই বা কি হইবে? সে পোষাকি ধর্ম্মে তোমারও পরিত্রাণ হইবে না, আমারও পরিত্রাণ হইবে না, জগতেরও পরিত্রাণ হইবে না।

ক্ষুদ্র আদর্শ লইয়া এরূপ সন্তুষ্টভাবে দিন কাটাইলে আর চলিবে না। আমাদের বর্ত্তমান জীবন লইয়া আমরা জগতের নিকট দুই পাঁচদিনের জন্য ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া পরিচিত হইতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? তাহাই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? এদিকে যে আমরা ঈশ্বরের নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী হইতেছি। তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির নিকট আমাদের বর্ত্তমান জীবনের অসারতা ও সঙ্কীর্ণতা যে পদে পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তিনি আমাদিগকে যে মহোচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছেন,

আমরা যে নিজের দোষে তাহা হারাইতে বসিয়াছি। ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আমরা কি বাস্তবিক বিশ্বাস করি যে, পরমেশ্বর ডাকিলে দেখা দেন? তাঁহাকে লাভ করা, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা, তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাই যে মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাহা কি আমরা বিশ্বাস করি? ইহা যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছি। আর ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া, প্রাণের মধ্যে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, তাঁহার সহিত নিত্যযোগ স্থাপন করা, এ সকল যদি বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগতের সত্য হয়, তবে বল ভাই! বল ভগ্নি! এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? তোমার আমার জীবনে চেষ্টা নাই, অধ্যবসায় নাই, বিশ্বাস নাই বলিয়া কি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে খর্ব্ব করিতে হইবে? কখনই না। ঈশ্বরদর্শন পূর্ব্বেও যেমন সম্ভব ছিল এখনও তেমনি সম্ভব আছে। এই উনবিংশ শতাব্দীতেও ঈশ্বর ডাকিলে দেখা দেন; এই বর্ত্তমান কালের সভ্যতা ও সাংসারিকতার কোলাহলের মধ্যেও দীনাত্মা হইলে হৃদয়ের নিভৃতনিলয়ে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ সুধাময় বাণী শ্রবণ করা যায়; আপনার দুর্ব্বলতা ও হীনতা অনুভব করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তিনি মৃতপ্রাণে শক্তি-সঞ্চার করেন। তবে আমরা এমন নির্জ্জীবভাবে পড়িয়া থাকিব কেন? ঈশ্বরদর্শন কি একটা তুচ্ছ ঘটনা? তাঁহার কথা শ্রবণ করা কি সামান্য ব্যাপার? সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি-

দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে কি আর কিছুর অভাব থাকে? কেবল আমাদের এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাস নাই বলিয়াই আমরা রাজার সন্তান হইয়াও আজি পথের ভিখারী।

এভাবে আর অধিক দিন চলিবে না। ক্ষুদ্র আদর্শ লইয়া কখনই আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা আমাদের এত যত্নের ব্রাহ্মসমাজ জলবিম্ববৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে, অথবা একটী ক্ষুদ্র জীবনবিহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসু কে কোথায় আছ? ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত হিতৈষী কে কোথায় আছ?—প্রস্তুত হও, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আর ক্ষুদ্র আদর্শ লইয়া কল্পিত আত্মপ্রসাদের সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে চলিবে না। এস—গভীর উপাসনারূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, বিশ্বাস অসি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি। এস—নিজ নিজ জীবনে দেখাই যে পরমেশ্বর ডাকিলে দেখা দেন, পাপীর সঙ্গে কথা কন, তাহার প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন। নতুবা শুধু মুখে দুইটা ধর্ম্মের কথা বলিলে জগৎ শুনিবে কেন? ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনভিন্ন শুধু ফাঁকা কথায় কে নিদ্রিত মানবাত্মাকে জাগাইতে পারে?

সজীব বিশ্বাস।

"যদি তোমাদের এক সর্ষপ কণা মাত্র বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা পর্ব্বতকে বলিবে 'স্থানান্তরিত হও,' অমনি উহা স্থানান্তরিত হইবে"—মহর্ষি ঈশার এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বিশ্বাস কি তাহা বুঝিয়াছেন। আমরা যাহাকে সচরাচর বিশ্বাস বলিয়া মনে করি তাহা বিশ্বাস নহে, বুদ্ধিগত সংস্কার মাত্র। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপে বিশ্বাস করি, অথচ আমার পাপ, সাংসারিকতা ও অপ্রেম দূর হয় না, এরূপ হইতেই পারে না; আমি পরলোকে বিশ্বাস করি অথচ আমি ঐহিক সুখের জন্ত দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছি ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; আমি ন্যায়, পবিত্রতা ও প্রেমের জয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি, অথচ আমার সৎকার্য্যে উৎসাহ নাই, একটু বাধা বিঘ্ন দেখিলেই আমি নিরাশ হইয়া পড়ি, সামান্য কারণে আমি অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হইয়া উঠি, একথার কোনও অর্থ নাই। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির পক্ষে অন্ধের ন্যায় আচরণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে দেখিয়া, বাঁচিবার ইচ্ছা সত্ত্বে আমি কখনই তাহাতে ঝাঁপ দিতে পারিনা। শরীরে আঘাত লাগান যদি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করি, তবে আমি কখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দণ্ডায়মান দেখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইতে পারি না। ইহার কারণ এই যে, আমি বহির্জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; উহা আমার নিকট সংস্কার বা কল্পনা মাত্র নহে; অগ্নিকুণ্ডের

অস্তিত্বে ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে আমার অটল বিশ্বাস আছে ; প্রাচীরের অস্তিত্বে ও উহার বাধা প্রদানের শক্তিতে আমার উজ্জ্বল বিশ্বাস আছে। যিনি আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এরূপ ব্যক্তি সম্মুখে রহিয়াছেন জানিয়া কোনও প্রকার অন্যায় বা অভদ্র ব্যবহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার অস্তিত্বে ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমরা যাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করি এরূপ ব্যক্তি আমাদের গৃহে আসিলে আমরা উপযুক্তরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য কতই না ব্যস্ত হই! ইহার কারণ এই যে, আমাদের সম্মানাস্পদ ব্যক্তি আমাদের গৃহে উপস্থিত ইহা সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। এক কথায় যাহার বিশ্বাস যেরূপ তাহার কার্য্যও তদনুযায়ী হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত বিশ্বাসই আমাদের জীবনের নিয়ামক। নিজের ও জগতের অস্তিত্বে মানুষের যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে তাহারই উপর তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত বিশ্বাসের প্রভাব সমস্ত জীবনের উপর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের নিজের ও বহির্জগতের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস যেরূপ উজ্জ্বল, আধ্যাত্মিক সত্যসম্বন্ধে যদি আমাদের সেইরূপ উজ্জ্বল বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া যাইত। তাহা হইলে আমাদের উপাসনা গাঢ়তর হইত, জীবন উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ হইত, পাপ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত, আমরা নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর

হইতে পারিতাম। একটী সামান্য আধ্যাত্মিক সত্যে যাঁহার যথার্থ বিশ্বাস আছে, তিনি জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারেন। একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনের প্রভাবে সমস্ত সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক সত্যের মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই মানুষ যখন প্রত্যক্ষভাবে কোন সত্য উপলব্ধি করে, তখন উহার প্রভাবে তাহার প্রাণে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিকরাজ্যে বাস্তবিকই বিশ্বাসের প্রভাবে মৃতপ্রাণে জীবনসঞ্চার হয়, অন্ধ চক্ষু লাভ করে, মূক ব্যক্তি বাক্‌শক্তি লাভ করে, বধিরের বধিরতা দূর হয়। ইহা কবিকল্পনা নহে, ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষিত সত্য। ঈশ্বরের সরল উপাসকমাত্রেই নিজ নিজ জীবনে অল্প বা অধিক পরিমাণে ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। উপাসনার মধ্য দিয়া যখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে কোন একটী আধ্যাত্মিক সত্য উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন, বিশ্বাসের বলে মৃতপ্রাণে জীবনসঞ্চার হওয়ার অর্থ কি। কিন্তু সাধনের অভাবে ঐ সকল সত্য আমাদের জীবনে স্থায়ী হয় না বলিয়াই আমরা আজিও অটল বিশ্বাস লাভ করিতে পারিতেছি না, আমাদের জীবনের স্রোত স্থায়িভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিতেছে না, আমাদের প্রাণে ধর্ম্মভাব ভাল করিয়া বসিতে পারিতেছে না, আমাদের জীবনের চঞ্চলতা দূর হইতেছে না।

যখনই আমরা আমাদের কোন্ বিশেষ আধ্যাত্মিক অবনতির মূল অনুসন্ধান করি, তখনই দেখি সেখানে অবিশ্বাস বর্ত্ত-

মান। উপাসনা ভাল লাগিতেছে না, মন নীরস হইয়া গিয়াছে, ভাই ভগিনীকে কর্কশ কথা বলিতে আর সঙ্কোচ বোধ করি না, কারণ খুঁজিতে গিয়া দেখি যে, সরস ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাব রহিয়াছে। কার্য্যে মনোযোগ নাই, অবাধে পরনিন্দা করিতেছি, অন্যের বিরুদ্ধে অমঙ্গল চিন্তা পোষণ করিতে প্রতিবন্ধক অনুভব করিতে পারিতেছি না, কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখি যে, প্রেমময় পিতায় বিশ্বাস নাই। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আপনার মন পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিতে পাইবেন যে, বিশ্বাস চক্ষুর অভাবে তিনি সূর্য্যালোকের মধ্যে বাস করিয়াও অন্ধকার দেখিতেছেন। বিশ্বাসী যেখানে জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়া কৃতার্থ হন, অবিশ্বাসী তথায় অন্ধকার ও কল্পনা অনুমান করিয়া বিষাদে নিমগ্ন হয়। অতি সামান্য কার্য্য করিয়া তাহা কার্য্যের নেতা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়া ভক্ত আনন্দে আপ্লুত হন, অতি মহৎ কার্য্য করিয়াও অবিশ্বাসী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্বাস বাস্তবিকই ধর্ম্মরাজ্যে চক্ষুঃস্বরূপ। যাঁহার বিশ্বাস নাই তিনি পণ্ডিত বা পরোপকারী হইতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে তাঁহার স্থান নাই।

অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই বিশ্বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সে বিশ্বাস সংস্কার মাত্র। আমরা কেন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই উত্তর দিবেন, "আত্মপ্রত্যয়ের প্ররোচনায়।" "ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে অবিশ্বাস করিব কিরূপে?"—একথা কয় জন লোক বলিতে পারেন? যদি বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাসে অপরের মুখে শুনিয়া

বা পুস্তকে পড়িয়া যে সংস্কার হয়, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পরোক্ষ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস নির্জ্জীব ও অকার্য্যকর। শুনা কথায় জীবনের গতি কি ফিরিয়া থাকে? সত্য স্বোপার্জ্জিত হওয়া চাই, হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা চাই, ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা চাই। আমরা অপরের উপদেশ শুনিয়া বা পাঠ করিয়া যে সকল সত্য শিক্ষা করি, যতদিন না সাধনদ্বারা তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারি, যতদিন না সেই সকল সত্য আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে, ততদিন আমাদের পক্ষে উহা মৃত ও শক্তিহীন। যে সত্য আমি ঈশ্বরের আলোকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, যে সত্যে আমার জ্বলন্ত বিশ্বাস নাই, আমার জীবনের উপর সে সত্যের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না; সে সত্য আমার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে না; সে সত্য আমাকে পরীক্ষা প্রলোভনের সময় রক্ষাকরিতে পারে না; সেসত্য আমাকে বা অপরকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না। যে ঈশ্বরের চক্ষুর তেজ স্বয়ং অনুভব না করিয়াছে, সে কি লোকের মুখের কথায় সতর্ক ও পাপ হইতে বিরত হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস বহিরের কথায় বদ্ধ হইয়া আছে, মুক্ত হইয়া কার্য্যপ্রবৃত্তির মূলে পঁহুছিতে পারে নাই। সেই জন্য আমাদের জীবনে বিষম বিরোধিতা। আমরা বলি এক, করি এক, আমরা মুখে আস্তিক, প্রাণে নাস্তিক। ব্যক্তিগত জীবনের এই বিশ্বাস হীনতা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান হীনবস্থার যে প্রকৃত কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।৹

জীবনে সরলতার আলোক আনয়নের জন্য সজীব বিশ্বা-সের অবতারণা আবশ্যক। আমাদের যে সংস্কার বা জ্ঞানগত সিদ্ধান্ত আছে, উপলব্ধিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সিদ্ধান্তরূপ হীন বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিতে হইবে। "ঈশ্বর আছেন" বলিলে হইবে না, "এই তুমি আমার কাছে রহিয়াছ" সমস্ত হৃদয়ের সহিত এই কথা বলিতে হইবে। অজ্ঞেয়তাবাদী ও কৌশল-বাদা দূরস্থিত ঈশ্বর লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে দূরে রাখিতে পারেন না। আমার প্রাণ প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, আমি কি তখন বিস্তীর্ণ ব্যবধানের অপর পারস্থিত ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সুখী হইতে পারি? পার্থিব জননীকে দেখিবার জন্য যখন পুত্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন কি সে দূরস্থিত জননীর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া সুখী হইতে পারে? দূরস্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য নিকট ঈশ্বরের প্রয়োজন। তাঁহার নৈকট্য এমন ভাবে অনুভব করিতে হইবে, যে নিশ্বাস বা হৃদয় তাঁহা অপেক্ষা নিকটতর বোধ হইবে না। কোনপ্রকার ব্যবধান থাকিলে হইবে না, আপনার আত্মা পর্য্যন্ত ব্যবধান থাকিবে না। যখন জীবত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সকল ব্যবধান বিলুপ্ত হয়, তখনই উভয়ের সেই মহা মিলন হয়, যাহার জন্য সাধুরা চিরকালই লালায়িত। তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদর্শন আরম্ভ হয়।

নিকট ঈশ্বরকে দুই প্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বিশ্বাসের শৈশবাবস্থায় সাধক জগতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন। স্থান ও কাল সমুদ্রে ভাসমান, বিচিত্র কৌশলময় ও

বিবিধরূপিণী শক্তিদ্বারা সঞ্চালিত এই বিশাল বিশ্বের মূলে সাধক আপন ইষ্টদেবতাকে দেখিয়া কৃতার্থ হন; ঋতুপরিবর্ত্তন, তাড়িতসঞ্চারণ, গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও আলোক-প্রবাহ প্রভৃতির মধ্যে জগদতীত কারণরূপী পরমেশ্বরকে সুস্পষ্ট বর্ত্তমান দেখিতে পান। এই যে ধরণীবক্ষঃস্থিত বিস্তীর্ণ বায়ুসমুদ্র যাহা অদৃশ্য, অথচ ভারবিশিষ্ট, ইহার প্রত্যেক পরমাণু-কম্পনে সাধক প্রভুর পরিচয় প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে প্রাণরূপী ঈশ্বর শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার অস্তিত্ব বিধান করিতেছেন, ইহা সাধন করিতে করিতে পরিশেষে অন্তরে ভক্তের দৃষ্টি পড়ে। তিনি সেথানে দেখেন যে, যে প্রভু স্রষ্টা ও কৌশলীরূপে বাহিরে বিদ্যমান, ভিতরে তিনি তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন। তখন জীবাত্মা বুঝিতে পারে যে, সে অসার ও পরমাত্মা সার, সে অকর্ম্মণ্য, পরমাত্মা পরিচালক, সে শূন্য, পরমাত্মা পূর্ণতা বিধায়ক। যে অভিমান বা আত্ম-বোধকে পাপের জননী বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না, তাহা ক্রমে তিরোহিত হয় ও সাধক শেষে ঈশ্বর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া জন্মের মত তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন। এই অবস্থায় ভক্ত সম্বন্ধ সাধন করেন। যাঁহার সঙ্গে জীবাত্মার অলৌকিক সম্বন্ধ মানব-ভাষায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে ভক্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন। ঈশ্বর দয়াময় পিতা, হিতকারী মিত্র, অদ্বিতীয় পরিত্রাতারূপে হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া ভক্তের প্রাণ কাড়িয়া লয়েন। সাধক যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণরূপে অন্তরে দেখেন তাহা নহে, তাঁহার প্রাণে ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস আবির্ভূত হয়। আর তাঁহার

দয়ায় অবিশ্বাস আসিতে পারে না। সাধক সহস্র নির্যাতন, যন্ত্রণা ও বিপদের মধ্যে অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন ও অন্য সকল আহ্বানের প্রতি বধির হইয়া প্রভুর আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করেন। রোগ, শোক, মৃত্যু, কোন অবস্থাতেই তিনি ম্রিয়মান হন না, এবং আশ্চর্য্য দেবভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়া, বিনীতভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। জগৎ সম্বন্ধে তিনি মৃত হন, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরানুপ্রাণিত প্রাণ হইতে এমন এক অগ্নিস্রোত নিঃসৃত হয়, যাহা জগতের পাপ, কপটতা, অবিশ্বাস ও অসত্য দগ্ধ করিয়া ঈশ্বর-কৃপাযোগে নবজীবন সৃষ্টি করে।

বিশ্বাস কিন্তু যতদিন সাধনসাপেক্ষ থাকে, ততদিন আত্মা নিরাপদ হয় না। সাধন ভজন করিলাম বিশ্বাস উজ্জ্বল রহিল, সাধন ভজনে শৈথিল্য আসিল বিশ্বাসও হীনপ্রভ হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাসের মধ্য অবস্থা। ইহার উপরে আর এক স্থান আছে, যেখানে বিশ্বাস সাধন সাপেক্ষ না হইয়া কেবল ঈশ্বরসাপেক্ষ হইয়া থাকে। তখন ঈশ্বরের দর্শন বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা বা নিষ্প্রভত্বের উপর নির্ভর করে না, আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন হওয়াতে ঈশ্বর তাহার মধ্যে আপনার শক্তি প্রকাশ করেন। ভক্ত ঈশ্বরের হাত ছাড়িয়া দেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার হাত ধরেন। ভক্ত ঈশ্বরকে দেখেন না, কিন্তু ঈশ্বর বলপূর্ব্বক ভক্তকে আপনার সৌন্দর্য্য দেখান। তখন ঈশ্বরের সত্তার উৎপীড়ন আরম্ভ হয়; ভাবিবার পূর্ব্বে প্রকাশ ও চেষ্টার পূর্ব্বে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভক্তকে প্রভু ক্রমাগত আত্ম পরিচয় দিতে থাকেন। ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসরাজ্যের নানা

স্থান পরিভ্রমণ করেন। অবিশ্বাসের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়; ভক্ত উন্মত্ত ও অধীর হইয়া ইষ্টদেবতাতে ডুবিয়া যান।

এই উজ্জ্বল বিশ্বাসের অভাবেই আমরা প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমরা যে সকল উচ্চ সত্যের আলোচনা করি, আমরা মুখে যে সকল বড় বড় কথা বলি, যদি তাহার একটী সত্যেও আমাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জীবন অগ্নিময় হইত। আমরা মুখে বলি, আমাদের উপাস্য দেবতা সত্যশিবসুন্দর, কিন্তু বাস্তবিক যদি আমরা তাঁহাকে সত্যশিবসুন্দর বলিয়া জীবনে উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতাম, তাহা হইলে কি ঐ বিশ্বাসের প্রভাব আমাদের জীবনে পরিলক্ষিত হইত না? তাহা হইলে কি আমাদের জীবনে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইত না? আমাদের জীবন সুন্দর ও দেবভাবাপন্ন হইত না? কাতর প্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর পাপীর হৃদয়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, কোন্ ব্রাহ্ম এ কথা না স্বীকার করেন? কিন্তু হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কয়জন বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়া থাকেন? পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ—ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনস্বরূপ এই মূল সত্যে কয়জনের যথার্থ বিশ্বাস আছে? কয়জন ব্রাহ্ম পরমেশ্বরকে আপনার ইষ্টদেবতারূপে হৃদয়ে বসাইতে সমর্থ হইয়াছেন? সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থায় তাঁহাকে একমাত্র গুরু, বন্ধু ও বিধাতারূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপর সকল আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন?—তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে

শিখাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা কি জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক? আমরা কি পরমেশ্বরের প্রকৃত বিশ্বাসী সন্তান? তবে কৈ সে ব্রহ্মতেজ আমাদের হৃদয়ে যাহা বিশ্বাসের চিরসঙ্গী? কৈ সে চরিত্রের প্রভাব আমাদের জীবনে যাহা প্রকৃত উপাসনার নিত্যসহচর? কৈ সে জ্বলন্ত, অগ্নিময় ভাব আমাদের প্রাণে যাহা জীবন্ত ঈশ্বর-দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল? আর যদি তাহাই প্রাণে লাভ করিতে না পারিলাম, তবে আর আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া ফল কি? একজন বিশ্বাসীর জীবনের প্রভাব সহস্র অল্প-বিশ্বাসীর আকাশভেদী বক্তৃতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। ভাই! তুমি কি ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান? তবে কথা কও, দুইটা স্বর্গের সংবাদ দিয়া তাপিত প্রাণকে শীতল কর। নতুবা চুপ করিয়া থাক; বক্তৃতা করিবার সাধ থাকে, রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে অথবা অন্য যেখানে ইচ্ছা যাও। ধর্ম্মসমাজে তুমি কিছু করিতে পারিবে না। উপদেষ্টা! তুমি কিসের উপদেশ দিতেছ? ধার করা কথা শুনিতে চাই না; দুইটা প্রাণের কথা বল, বিশ্বাসের কথা বল। তাহা যদি না পার, তবে তোমার উপদেশে আমার শুষ্ক প্রাণ ভিজিবে কিরূপে? প্রচারক! তুমি কি প্রচার করিতে যাইতেছ? যদি প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন পাইয়া থাক, যদি পরমেশ্বর কি পদার্থ চিনিয়া থাক, তাঁহাকে প্রাণের সিংহাসনে বসাইতে পারিয়া থাক, যদি দুইটা বিশ্বাসের কথা বলিতে পার, তবে এস আমার নির্জীব প্রাণে একটু আগুন জ্বালিয়া দাও।—এ কি? তোমার হৃদয় এত শীতল কেন? তবে তুমি পরের প্রাণে

আগুন জ্বালিবে কিরূপে? ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাসী লোকের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকৃত বিশ্বাসব্যতীত আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিব না; প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজ হইতে জগৎ কোনও স্থায়ী উপকার লাভ করিতে পারিবে না।

অনন্যপরায়ণ হইয়া সাধু মহাজনদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ পূর্ব্বক যদি আমরা প্রভুকে অন্বেষণ করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি। যিনি প্রভুকে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও প্রতারিত হন না, যিনি সংসার লইয়া প্রতারিত হন, তিনি মৃত্যুমুখে গমন করেন।

উপাসনার আদর্শ।

ধর্ম্মজীবনের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপাসনার আদর্শও ক্রমে খাট হইয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনাপ্রণালী জগতে আর কুত্রাপি আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহার ভিতরে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে, ইহার প্রকৃত রস একবার আস্বাদন করিতে পারিলে, স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যায়, আত্মা এক নূতন রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে, জীবন সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করে, জগতের সমস্ত ব্যাপার নূতন ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। এই উপাসনাই ব্রাহ্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধন ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে

পারিলে আর যাহা কিছু সমস্ত সহজ হইয়া আসে। ইহার ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, ইহার ভিতর দিয়াই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্যযোগ সংস্থাপিত হয়, ইহার প্রভাবেই প্রাণে প্রেম ভক্তির উৎস খুলিয়া যায়, ইহার আলোকেই বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, পাপের অন্ধকার বিদূরিত হয়, ইহার আলোকেই আমরা আমাদের প্রকৃত হীনতা ও অভাব অনুভব করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হই, ইহার ভিতর দিয়াই সাধক ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হন। এই উপাসনার ভিতর ডুবিতে পারিলে মৃত প্রাণে জীবনসঞ্চার হয়, আত্মার দিব্য চক্ষু খুলিয়া যায়, সংসার বন্ধন, পাপের বন্ধন ছিন্ন হয়, প্রাণের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, জীবন মধুময় হয়। ইহা কোনও কালেই পুরাতন হয় না। অনন্ত স্বরূপের সাধনা কি কখনও পুরাতন হইতে পারে? ইহার ভিতর যতই নিমগ্ন হওয়া যায়, ততই নূতন হইতে নূতনতর সৌন্দর্য্য, গভীর হইতে গভীরতর সত্য প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে।

কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমরা এমন সুন্দর, এমন মধুর উপাসনার আদর্শ পাইয়াও ইহার ভিতরে ডুবিয়া যাইতে পারিতেছি না; কেবল উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনাদিতে এই আদর্শ উপাসনাপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আমরা এই উপাসনা সাধ্যানুসারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি না। আমাদের উপাসনা ক্রমে ভাবশূন্য

মুখের কথায় পরিণত হইবার পথে চলিয়াছে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ যাঁহারা আজি কালি ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক, প্রার্থনাকেই উপাসনার সার বলিয়া মনে করেন। আরাধনা ও ধ্যান ভিন্ন যে উপাসনা পূর্ণ হয় না, ইহা তাঁহাদের চিন্তাতেও আসে না। অপরদিকে যাঁহারা আরাধনা ধ্যান প্রার্থনাসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার কতকগুলি ভাসা ভাসা, অভ্যস্ত কথা বলিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন; উপাসনার ভিতর একেবারে ডুবিবার জন্য তাঁহাদের অণুমাত্র ব্যাকুলতা নাই। আমাদের জীবন ক্রমে এত লঘু হইয়া পড়িয়াছে যে. ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে মগ্ন হইবার প্রবৃত্তিই আমাদের নাই বলিলে চলে। ব্রাহ্মের দৈনিক উপাসনা কেবল প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে পারে না। কাজেই ব্রাহ্মের সামাজিক উপাসনা ও উৎসবাদিও ক্রমে সেইরূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রাতঃকালের উপাসনার বলে যদি সমস্ত দিন ভাল না যায়, সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনার বেগ যদি অন্ততঃ সপ্তাহের অর্দ্ধেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যকারী না হয়, এক একবারের উৎসবে যদি অন্ততঃ ছয় মাসের সম্বল লাভ করা না যায়, তবে আর উপাসনা কি হইল? দৈনিক জীবন যতই শুষ্ক ভাবে কাটুক না কেন, উৎসবের সময় আমরা আজিও পূর্ব্বস্মৃতি অথবা ক্ষণিক ভাবোচ্ছাসের প্রভাবে এক আধ ফোঁটা চক্ষের জল

ফেলিয়া থাকি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে সে জলে প্রাণের গভীর পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। উৎসবের দুই চারি দিন পরেই আমাদের জীবন যেরূপ হীন, নীরস ও লঘু হইয়া পড়ে তাহাই আমাদের কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যদি এই ভাবে আর কিছুদিন যায় তাহা হইলে ব্রাহ্মের উপাসনা শুকমুখনিঃসৃত বচনাবলীর ন্যায় জীবনহীন হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মের চরিত্রের প্রভাব হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মের জীবন মরুভূমি হইয়া পড়িবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্তভাব চলিয়া যাইবে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনের জন্য আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মুখে পতিত হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ব্রাহ্ম জীবনের বর্ত্তমান দুর্গতির সর্ব্বপ্রধান কারণ উপাসনাহীনতা। ব্রাহ্মগণ যে উপাসনা প্রার্থনার সম্পর্ক ছাড়িয়া একেবারে নিরীশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের বিবেচনায় আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার ভিতর এখনও ডুবিতে পারি নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শুষ্ক প্রার্থনা লইয়া সন্তুষ্ট আছেন। আরাধনা ও ধ্যান যে উপাসনার পূর্ণতার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে না। অপরদিকে, যাঁহারা প্রাত্যহিক জীবনে পূর্ণাঙ্গ উপাসনাপদ্ধতি ধরিয়া আছেন, তাঁহাদেরও উপাসনা ক্রমে অন্তঃসারবিহীন, মৌখিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক কথায়, আমরা আমাদের উপাসনার আদর্শ ক্রমে খাট করিয়া ফেলিতেছি। এই জন্যই উহা আমাদের প্রাণের মর্ম্মস্থল

স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই অন্যান্য দিকেও আমাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দিন দিন হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। নতুবা আজি আমাদিগকে ব্রাহ্মজীবনের দুর্দ্দশা দেখিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে কেন? নতুবা আজি আমাদিগকে এমন নিদারুণ কথা শুনিতে হইবে কেন যে, ঈশ্বরের আরাধনা, ধ্যান ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে প্রাণ সরস হয় না, বিগলিত হয় না? ধিক্ আমাদের জীবনে! ঈশ্বরের উপাসক নাম গ্রহণ করিয়া এরূপ হৃদয়বিদারক অবিশ্বাসের কথা শ্রবণ করা অপেক্ষা যে আমাদের পক্ষে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর ছিল! ঈশ্বরোপাসনায় যদি প্রাণ সরস না হয়, তাঁহার কৃপায় যদি পাষাণ দ্রবীভূত না হয়, চরিত্র উন্নত না হয়, তাঁহার প্রেমে যদি সমস্ত অপ্রেম, শুষ্কতা বিলুপ্ত না হয়, তবে হয় কিসে? ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য আমরা ভিন্ন আর কে দায়ী? আমরা যদি উপাসনার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, আমাদের জীবনে যদি সেই প্রেমময়ের প্রকাশ ভাল করিয়া দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আজি আমাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপ অবিশ্বাসের কথা শুনিতে হইত?

মুক্তিদাতা পরমেশ্বর আমাদের পরিত্রাণের জন্য বর্ত্তমান যুগে এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধান প্রেরণ করিয়া পথের সম্বলের জন্য এই আরাধনাদিসমন্বিত উপাসনাপদ্ধতিরূপ মহারত্ন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা-প্রণালী আর কোনও ধর্ম্মসমাজে নাই। এমন সুমিষ্ট সাধন আর কোথায় আছে? এই সাধন জীবনে আয়ত্ত করিতে না পারিলে আমাদের দুর্গতি দূর হইবে না, আমরা

কথনই পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। উপাসনার দ্বার দিয়াই ঈশ্বরের কৃপা মনুষ্যহৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে। ইহা স্বর্গরাজ্যের পথস্বরূপ। ইহার মধ্য দিয়াই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রাণপ্রদ, আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ সংঘটিত হয়। কিন্তু কেবল মুখে এই পদ্ধতির অনুসরণ করিলে কিছু হইবে না। ইহার মধ্যে ডুবিতে হইবে। আরাধনার ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের সত্তার মধ্যে ডুবিতে হইবে; তাঁহার অনন্ত ভাবের মধ্যে ডুবিয়া হারাইয়া যাইতে হইবে; তাঁহার আনন্দ শান্তির মধ্যে ডুবিয়া প্রাণ শীতল করিতে হইবে; তাঁহার গভীর প্রেমসাগরে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে হইবে; তাঁহার পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া পবিত্র ও সুন্দর হইতে হইবে। গভীব ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রার্থনার গভীরতা ও ঐকান্তিকতার মধ্যে ডুব দিয়া নিত্য উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক ব্যথিত হইয়াছেন, আপনাদের হীনতা দেখিয়া যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিক কাঁদিয়াছে, পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া, প্রাণের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাঁহারা ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চান, তাঁহারা সকলে একান্ত মনে সজনে, নির্জ্জনে এই উপাসনারূপ মহাসাধনের মধ্যে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করুন; সরল অন্তরে, প্রাণ খুলিয়া সেই ইষ্টদেবতার সুন্দর মধুর প্রকৃতির মধ্যে ডুবিতে চেষ্টা করুন;—দেখিবেন অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে, ব্রাহ্মসমাজের মলিন

মুখ আবার উজ্জ্বল হইবে, আমাদের জীবনের গতি ফিরিয়া যাইবে, নিত্য উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবে।

"যে জন সাহসে ভর ক'রে অগাধ প্রেমসিন্ধুনীরে, একবার ডুবিতে পারে;

সে আর চাহে না ফিরে আসিতে, মগ্ন হয়ে আনন্দেতে, করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন, ভোলে জন্মের মতন সংসার-বাসনা।"

পূর্ণাঙ্গ উপাসনা।

১

জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতাই যদি ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য হয়,—জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতার সমষ্টিই যদি ধর্ম্মজীবন হয়, আর উপাসনাই যদি ধর্ম্মজীবনের প্রস্রবণ হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত উপাসনা বলি, যে উপাসনাতে প্রভূত পরিমাণে জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা অনুভূত হয়। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা কোথা হইতে আসিবে? যে উপাসনাতে উজ্জ্বল ঈশ্বর দর্শন হয় না, হৃদয় প্রেমানন্দে উচ্ছ্বসিত হয় না, প্রাণে প্রবল পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা উদিত হয় না, সে উপাসনা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কিরূপে আনয়ন করিবে? জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাস, সুমধুর প্রেম-ভক্তি, উজ্জ্বল পবিত্রতা যদি জীবনে লাভ করিতে হয়, তবে উপাসনাকালে এই সমুদায় ভাব গাঢ়রূপে অনুভব

করা আবশ্যক, প্রচুর পরিমাণে লাভ করা আবশ্যক। উপাসনাকালে যত অধিক পরিমাণে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা অনুভূত হইবে, কার্য্যগত জীবনে এই সমুদায় ভাব ততই বিস্তৃতরূপে ব্যাপ্ত হইবে। সুতরাং প্রকৃত উপাসনা তাহাকেই বলা যায় যাহাতে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা প্রভূতরূপে উপলব্ধ হয়। দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে উপাসনার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যে প্রণালী জ্ঞানপ্রীতিপবিত্রতাসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবনকে লক্ষ্যস্থলে রাখে না, অথবা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে যে প্রণালী উপযোগী নহে, সে প্রণালী প্রকৃত উপাসনাপ্রণালী নামের উপযুক্ত নহে, এবং যে সাধক এরূপ অঙ্গহীন উপাসনা লইয়া পরিতৃপ্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ বুঝিতে পারেন নাই। উপাসনা প্রণালী যতই ভিন্ন ভিন্ন হউক না কেন, ইহার গঠন অন্ততঃ এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহা অবলম্বন করিলে উপাসনাকালে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা অনুভূত হইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আরাধনা-ধ্যান-প্রার্থনাসমন্বিত উপাসনাপ্রণালী গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফল। ইহা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই জন্যই আমরা ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অঙ্গের প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ভাবে, অল্প বা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস, প্রীতি ও পবিত্রতা লাভের সাহায্য করে। কিন্তু ইহার এক একটী অঙ্গ সাক্ষাৎভাবে এবং বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম জীবনের এক একটী বিশেষ উপকরণ

লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। আরাধনা বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা সমুদায় লাভেরই সাহায্য করে, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে ভক্তিসাধনের উপায়। ধ্যান অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা সমুদায়েরই সাধন, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে জ্ঞান বা বিশ্বাসের সাধন। প্রার্থনা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎভাবে বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতা সমুদায়ই আনয়ন করে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ইহা পবিত্রতার আকর পবিত্র স্বরূপের সহিত ইচ্ছাযোগ সাধনের উপায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে জ্ঞান-ভক্তি-পবিত্রতা-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনার সম্বন্ধে ধ্যান জ্ঞানের দিক্, আরাধনা ভক্তির দিক্, আর প্রার্থনা পবিত্রতার দিক্। ধ্যানের সার উজ্জ্বল উপলব্ধি, আরাধনার সার উচ্ছ্বসিত ভক্তি, প্রার্থনার সার পবিত্র ইচ্ছাযোগ—ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। প্রকৃত উপাসনাতে এই তিনটী ভাবই স্পষ্টরূপে এবং গভীর ভাবে থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "এক প্রার্থনার ভিতরে তো বিশ্বাস, ভক্তি ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা তিনই আছে; ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে কেহ প্রার্থনা করে না, কিয়ৎ পরিমাণে অনুরাগ বা প্রীতি না থাকিলেও প্রার্থনা হয় না, এবং পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা তো আছেই, তবে আর স্বতন্ত্রভাবে ধ্যান ও আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি?" এই কথার উত্তর এই যে, কেবল প্রার্থনাতে পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষাই সাক্ষাৎ এবং বিশেষভাবে বর্ত্তমান, বিশ্বাস ও ভক্তির দিক্ কেবল অসাক্ষাৎ বা অস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান; সুতরাং উজ্জ্বল বিশ্বাস ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিলাভ করিতে হইলে ইহাদের সাক্ষাৎ সাধনরূপী ধ্যান ও আরাধনার আশ্রয় গ্রহণ

করিতে হইবে। সাধকজীবনের অভিজ্ঞতাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে জীবনে বা সম্প্রদায়ে একমাত্র ধ্যান সাধনেরই প্রবলতা, সে জীবনে বা সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু ভক্তি ও ইচ্ছার দিক্ তাদৃশ উন্নত হয় নাই; যে জীবনে বা সম্প্রদায়ে কেবল আরাধনা বা তৎস্থানীয় নামসাধন ও গুণকীর্ত্তনের প্রবলতা, সে জীবন বা সম্প্রদায়ে বিশেষ ভাবে ভক্তির উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞান ও ইচ্ছার দিক্ তাদৃশ উন্নত হয় নাই; সেইরূপ, যে জীবন বা সম্প্রদায়ে কেবল প্রার্থনা সাধনেরই প্রবলতা, সে জীবন বা সম্প্রদায় ইচ্ছার পবিত্রতা ও কার্য্যকারিতায় বিশেষ-ভাবে উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু গভীর উপলব্ধি ও মধুর ভক্তি-ভাবে তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণভাবে বলিতে গেলে প্রাচীন বৈদান্তিকগণ প্রথম উক্তির, বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বিতীয় উক্তির এবং খ্রীষ্ট শিষ্যগণ তৃতীয় উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা সাধন করা আবশ্যক। উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উপাসনা প্রণালীতে উপরোক্ত তিনটী বিধানের বিশেষ বিশেষ ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। বৈদান্তিক যোগীর গভীর সমাধি, বৈষ্ণব ভক্তের মধুর গুণকীর্ত্তন এবং খ্রীষ্টীয় সেবকের ব্যাকুল প্রার্থনা, এই তিন সাধনাঙ্গই আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হইবে।

জীবন্ত উপাসনার জন্য তিনটী উপকরণ আবশ্যক। (১) উপাসনার সর্ব্ব প্রধান উপকরণ সজীব বিশ্বাস। এই বিশ্বাস না থাকিলে প্রত্যক্ষ উপাসনা অসম্ভব, পরোক্ষ উপাসনায় আত্মার উপকার হয় না। জ্ঞানভক্তিযোগে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া উপাসনা আরম্ভ করিতে হইবে।

(২) উপাসনার আর একটী উপকরণ প্রেম। প্রকৃত বিশ্বাস থাকিলে প্রেম নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু এই দুইটী ভাবকে পৃথক্ করা যায়। উপাসনা অল্পাধিক পরিমাণে কেবল জ্ঞান ও বিশ্বাসমূলক হইলেই যে সরস হইবে তাহা নহে। বিশ্বাস ও উজ্জ্বল উপলব্ধি হেতু এক প্রকার আনন্দ অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহা প্রেমানন্দ নহে। জ্ঞানানন্দ স্থায়ী হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় যে উহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। উপাসনায় প্রেম না থাকিলে সে উপাসনা হৃদয়স্পর্শী ও নবজীবনদায়ী হয় না। ব্রহ্মব্যাপিত্ব ও ব্রহ্মশক্তি বেশ স্ফূর্ত্তি পাইল, অথচ দেখিতে পাই যে প্রাণের ভিতরের একটা দিক্ কেমন শুকাইয়া রহিয়াছে। প্রাণ সরস করিবার জন্য তাই প্রেমের আবশ্যকতা। প্রেম সম্বন্ধ-মূলক। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুভূত না হইলে প্রেম হওয়া কঠিন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নানা প্রকার, সুতরাং প্রেমও এক প্রকার নহে। অবস্থা-ভেদে সাধক বিশেষ বিশেষ প্রেমভাব সাধন করিবেন। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

(৩) উপাসনার তৃতীয় উপকরণ দীনতা। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "দীনাত্মারই ধন্য, কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই"

স্বর্গরাজ্যে তৃণের বড় আদর। শ্রীচৈতন্য বলিয়া গিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" মহর্ষি বায়েজিদকে ঈশ্বর বলিলেন, "বায়েজিদ, যদি আমাকে চাও এরূপ কিছু লইয়া এস যাহা আমার নাই।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তাহা কি যাহা তোমার নাই?" ঈশ্বর বলিলেন, "দীনতা।" দীন হীন অকিঞ্চন না হইলে প্রভুর কাছে আসন পাওয়া যায় না। আপনার দিক্ যত নিবিয়া যায়, প্রভুর আলোক তত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আপনার অসারত্ব ও অপদার্থতার উপলব্ধি যত প্রগাঢ় হয়, ব্রহ্মের সারবত্তা ও সত্যভাব প্রাণে তত ফুটিয়া উঠে। দীনতাই ভক্তি, প্রার্থনা ও অনুতাপের জননী। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই দীনতার একদিক্ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কিন্তু এই দীনতা ভাবুকতাতে বদ্ধ রহিয়াছে। পশ্চিমে মহর্ষি ঈশার শিষ্যগণের ভিতর দীনতার অপর দিক্ বিকাশ লাভ করিয়াছে। অনুতাপ ও প্রার্থনা ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট, কিন্তু গভীর আরাধনাপ্রসূত ভক্তির অভাবে সকলি যেন নীরস ও শুষ্ক।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মপূজার জন্য জগতের সকল ধর্ম্মের উপাসনার উপকরণের সার চাই। ইহাতে উপনিষদের আত্মতত্ত্ব, গীতার নিষ্কাম প্রীতি, খৃষ্টীয়ানের প্রার্থনা এবং বৈষ্ণবের ভক্তি আবশ্যক। এ সকল স্বর্গীয় উপকরণ সংগ্রহ করা কি মানুষের সাধ্য? অথচ ইহা না হইলে হৃদয়স্পর্শী উপাসনা হয় না, আর হৃদয়স্পর্শী উপাসনা না হইলে দিন চলে না। এই স্বর্গীয় উপকরণ যে পথে গেলে পাওয়া যায়, আমাদিগকে সেই পথে চলিতে হইবে।

আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনাসমন্বিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনাই সেই পথ। সরল আত্মা এই তিন অঙ্গকে পৃথক্ করিতে পারে না, আরাধনা করিতে করিতে ধ্যানে গিয়া পড়ে, ধ্যান করিতে করিতে প্রার্থনায় গিয়া পড়ে। আরাধনায় অনেক সময় কিয়ৎ পরিমাণে ধ্যান ও প্রার্থনার ভাব আসিয়া থাকে, প্রার্থনায় অনেক সময় আরাধনা ও ধ্যানের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন যদি সরল বিনীত ও ঈশ্বরোন্মুখ থাকে, তবে এই তিন অঙ্গ অবশ্যই স্ফূর্ত্তি পাইবে। যাঁহারা কেবল প্রার্থনারই আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আরাধনা ও ধ্যানের সার অতি নিগূঢ়ভাবে প্রার্থনায় মিশ্রিত আছে। প্রার্থনা যে করিব, কার কাছে? শূন্যের নিকট তো প্রার্থনা হয় না। জীবন্ত ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা অনুভব না করিলে কি প্রার্থনা করা যায়? প্রার্থনা কি দূরত্ব দূর করা নহে? প্রভুর নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছি, তাঁহার মুখচ্ছবি ক্রমেই মলিন হইয়া পড়িতেছে এমন সময়েই তো প্রাণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। আবার দেখুন, দাতার দাতৃত্বে যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে কোনও ভিক্ষুকই তাঁহার নিকট যায় না। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন, আমাদের আত্মার কল্যাণবিধান ও অভাবমোচন করেন, এ বিশ্বাসবিহীন হইয়া কে প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইবে? কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের জীবন্ত বর্ত্তমানতা ও অনুপম দয়া অগ্রে উপলব্ধি করিতে হয়, পরে প্রার্থনা প্রাণ হইতে উত্থিত হয়।

আরাধনা কেবল ঈশ্বরের গুণানুবাদ নহে। আরাধনা

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করা। এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। সৌন্দর্য্য না দেখিলে অনুরাগ হয় না, অনুরাগ না হইলে পূজা হয় না, পূজা না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। বিষয় মদে মত্ত জীবের গ্রীবা গর্ব্বে সদাই স্ফীত, ব্রহ্মসৌন্দর্য্য সে গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার এক প্রধান উপায়। সে সৌন্দর্য্যের কণিকা মাত্র যখন আত্মাতে আসিয়া পড়ে, তখন প্রাণ বাস্তবিকই তৃণ হইতে অধিক দীনতা লাভ করে। যতই সে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ঘনীভূত হয়, ততই তাহার রশ্মিতে উপাসক আপনার মলিনতা ও কুৎসিতরূপ দেখিয়া কুণ্ঠিত হন ও তাঁহার প্রাণ হইতে ব্যাকুল প্রার্থনার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা, অনুপম সৌন্দর্য্য ও অপার করুণা যে উপলব্ধি করিল, আরাধনা ও ধ্যান করিতে তাহার আর কি অবশিষ্ট রহিল? সেইরূপ যিনি মনে করেন যে, প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই, কেবল আরাধনা ও ধ্যানেই চলিতে পারে, তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি তাঁহার প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন? প্রভুর প্রেম ও সৌন্দর্য্যবাণে আহত হইলেন, অথচ আহত প্রাণ হইতে প্রার্থনার প্রবাহ নিঃসৃত হইল না, প্রভুর স্বরূপের আলোকে নিজের মলিনতা দেখিলেন, অথচ সে মলিনতা দূর করিবার ইচ্ছা হইল না, এ কি প্রকার আরাধনা ও ধ্যান করা? তাঁহাকে আমরা আরও জিজ্ঞাসা করি যে, মলিন জীব হইয়া বিনা প্রার্থনায় তিনি ব্রহ্মের নিকট কিরূপে অগ্রসর হইলেন? ভক্তের উদার প্রাণ যে অনন্ত পরমেশ্বরের মহিমা ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়, তিনি কিরূপে উন্নতমস্তকে

সেই মহিমা-সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন? জীবের সাধ্য কি যে সে আপন চেষ্টায় সেই অসীম বিরাট পুরুষের উপাসনা করিবে? ব্রহ্ম যদি তাহাকে উপাসনা করান, তবেই সে উপাসনা করিতে পারে। আর ধ্যানের তো কথাই নাই। যেখানে উপাস্য দেবতায় ও উপাসকে বিরলে আলাপ হয়, সেখানে যাওয়া কি সহজ কথা? বিনা প্রার্থনায় তথায় কে যাইবে? যখন ব্রহ্ম হাতে ধরিয়া, তাঁহার পুত্র কন্যাকে সেই নিভৃত অধ্যাত্ম রাজ্যে লইয়া যান, তখনই তাহারা সেখানে যাইতে পারে। আগে প্রার্থনাই কর, বা আগে আরাধনাই কর, ইহার কোনও অঙ্গই ছাঁটিয়া ফেলিতে পার না, উপাসনা অঙ্গহীন করিলে জীবনও অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। তবে বিশেষ প্রার্থনা স্বভাবতঃই আরাধনা ও ধ্যানের পর আসিয়া পড়ে। মানবতত্ত্ব উত্তমরূপে অনুশীলন করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবপ্রকৃতির সম্যক্ উপযোগী এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে সকলেরই এই পূর্ণাঙ্গ উপাসনার পথ অবলম্বন করা উচিত।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপাসনা। *

অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, নিজ জীবনেই ইহা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়াছি, যে একজন ব্রাহ্ম প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে

---

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের ভাব গ্রহণে লিখিত।

উপাসনা করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হয়ত সরস ভাবও পাইতে-ছেন, অথচ তাঁহার জীবন উন্নত হইতেছে না। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, তথাপি জীবনের কিছুই উন্নতি লক্ষিত হয় না। ধর্ম্ম সমাজে এরূপ জীবন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের চরিত্র নির্দ্দোষ, যাঁহারা পরোপকারী, কর্ম্মঠ লোক, ভাল কথাও অনেক কহিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের আভ্যন্তরিক জীবন-স্রোত জমিয়া গিয়াছে, প্রবাহশূন্য হইয়া গিয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের ঈশ্বরোপলব্ধি যত টুকু ছিল, আজিও ঠিক্ তত টুকু আছে, তাঁহারা ঈশ্বরকে উজ্জ্বলতরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ঈশ্বরকে যতটুকু প্রীতি করিতেন, আজিও ততটুকুই করিতেছেন, তাঁহা-দের ঈশ্বর-প্রীতি কিছুই বর্দ্ধিত হয় নাই। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিতেন, এখনও তত টুকুই পারেন, অধিক পারেন না। পূর্ব্বে সংসারের প্রতি, নিজের সুখ স্বার্থের প্রতি যতটুকু আসক্তি ছিল, আজিও তাহাই আছে, কিছুই কমে নাই। পূর্ব্বে মুখের চেহারা যেরূপ ছিল, আজিও তাহাই আছে, মুখে কোন উজ্জ্বলতর রেখা পড়ে নাই। এরূপ অবস্থা অল্লা-ধিক পরিমাণে সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। এরূপ অবস্থাতে হৃদয়ের বরফ যে একেবারেই গলে না তাহা নহে। হয়ত উৎসবাদি উপলক্ষে, হয়ত কোন বিশেষ শুভ ঘটনা উপলক্ষে, কোন সাধুর সহবাসে হৃদয় কখনও কিয়ৎ পরিমাণে

বিগলিত হয়, জীবনে কতক সংগ্রাম উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংগ্রামে কেবল এই মাত্র লাভ হয় যে, জীবনের যতটুকু উন্নতি হইয়াছে, ততটুকু কোন প্রকারে রক্ষিত হয়, জীবন পশ্চাদ্‌গামী হয় না। কিন্তু এই সংগ্রামে জীবন স্থায়ী ও ক্রমিক উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠিত হয় না, জীবনে অবিচ্ছেদ্য উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হয় না।

এরূপ দুরবস্থার কারণ কি? এরূপ দুরবস্থার নানা কারণ থাকিতে পারে; একটী বিশেষ কারণ প্রত্যক্ষ উপাসনার অভাব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। নিজের অভিজ্ঞতাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পরিচয় না পাইয়া, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে প্রকৃত বস্তু বলিয়া অনুভব না করিয়া, 'তিনি আছেন, ইহা সাধুমুখে বা লোকপরম্পরায় শুনিয়া, অথবা অধিক হইলে সৃষ্টিকৌশলাদি দেখিয়া বুদ্ধিদ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব স্থির করিয়া যে বিশ্বাস জন্মে, সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যে উপাসনা করা যায়, সে উপাসনাকে পরোক্ষ উপাসনা বলিতেছি। সংক্ষেপতঃ, পরোক্ষ, অসাক্ষাৎ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে উপাসনা, তাহারই নাম পরোক্ষ উপাসনা। আর, ঈশ্বরকে অন্তরে বাহিরে প্রকৃত, অনতিক্রমণীয় সত্তারূপে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া যে জীবন্ত উপাসনা করা যায় তাহারই নাম প্রত্যক্ষ উপাসনা। এই দ্বিবিধ উপাসনার কতিপয় লক্ষণ, ফল এবং ইহাদের কয়েকটী পার্থক্য যথাসাধ্য উল্লেখ করিতেছি।

১। পরোক্ষ উপাসনা অল্পাধিক পরিমাণে কল্পনার অধীন। ইহাতে "ঈশ্বর আছেন," "ঈশ্বর আছেন," বা "তুমি আছ,"

"তুমি আছ," এরূপ চিন্তাদ্বারা অথবা কোন নামজপদ্বারা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ চিন্তা বা জপে যে কিছু উপকার হয় না তাহা নহে, অনেক উপকার হয়। ইহাতে মনের চঞ্চলতা দূর হয়; ইহাতে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য ঈশ্বরের বর্ত্তমানতাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ও হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হয়। কিন্তু ইহাতে যে ঈশ্বরোপলব্ধি হয় তাহা প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধি নহে। উহা কেবল মানসিক ব্যায়ামের ফল, আত্মাতে ঈশ্বরের স্বয়ং প্রত্যক্ষ প্রকাশ নহে। ইহা যে কেবল মানসিক ব্যায়ামের ফল, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকাশ নহে তাহার কারণ এই যে, এরূপ উপাসনার অব্যবহিত পরেই ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দেহ আসিতে পারে এবং সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকাশ উপলব্ধি করিলে এরূপ হইত না। প্রত্যক্ষ উপাসক যিনি তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি করিবার জন্য "তুমি আছ" "তুমি আছ" বলেন না, কোন নামও জপ করেন না, তিনি কেবল প্রজ্ঞাচক্ষুতে, জ্ঞানমার্জ্জিত চক্ষুতে আত্মার দিকে এবং আত্মার ভিতর দিয়া জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এই দৃষ্টি ঠিক্ খাটি দৃষ্টি হইলেই আত্মাসনে আসীন, জগদাসনে আসীন ঈশ্বর প্রত্যক্ষীভূত হন। এই প্রত্যক্ষ প্রকাশের উজ্জ্বলতার তারতম্য আছে, কিন্তু এই প্রকাশের কণামাত্র লাভ করিলেও তাহার ফল শীঘ্র বিনষ্ট হয় না।

২। পরোক্ষ উপাসনাতে ঈশ্বরের স্বরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আনিতে হয়; প্রত্যক্ষ উপাসনাতে ব্রহ্মস্বরূপ আপনা হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়। পরোক্ষ জ্ঞানে যে বস্তুকে জানা

যায়, তাহার স্বরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া না আনিলে আসিবে কেন? কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর বস্তুর স্বরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আনিতে হয় না, প্রত্যক্ষ ভাবেই চক্ষুর সমক্ষে পড়ে। পরোক্ষ উপাসক শুনিয়াছেন বা বুদ্ধিদ্বারা জানিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রাণ-স্বরূপ, তাই তাঁহাকে প্রাণস্বরূপ বলিয়া আরাধনা করেন; প্রত্যক্ষ উপাসক প্রাণের ভিতরে প্রাণস্বরূপকে অনুভব করেন; তাই বলেন, "তুমি প্রাণস্বরূপ"। পরোক্ষ উপাসক সাধুমুখে শুনিয়া বা বুদ্ধির মীমাংসা স্মরণ করিয়া বলেন, "তুমি জ্ঞানস্বরূপ"; প্রত্যক্ষ উপাসক ঈশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রাণে অনুভব করিয়া বলেন "তুমি জ্ঞানস্বরূপ"। পরোক্ষ উপাসক সাধু-মুখে অথবা জগতের কি নিজ জীবনের কতকগুলি ঘটনায় ঈশ্বরের দয়ার যে পরিচয় পাইয়াছেন, সেই সকল স্মরণ করিয়া ঈশ্বরকে বলেন "তুমি প্রেমময়"। প্রত্যক্ষ উপাসক যে ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্য ভাবেন না তাহা নহে, কিন্তু তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম দৃষ্টি উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রেম স্পর্শ অনুভব করিয়া বলেন, "তুমি প্রেমময়," "এই যে তোমার প্রেম দৃষ্টি," "এই যে তোমার প্রেম স্পর্শ," তার পরে প্রয়োজন হইলে তাঁহার কীর্ত্তি আলো-চনা করিতে যান।

৩। পরোক্ষ উপাসনার সহিত ভাবের কোন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই। যদি দৈবাৎ মন শান্ত থাকে, বাহিরের অবস্থা অনুকূল থাকে, তবে হয়ত ভাবের উদ্রেক হইতে পারে। কখন কখন কোন অজ্ঞাত গূঢ় কারণে অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও ভাবের উদ্রেক হয় না। পরোক্ষ উপাসনায় ভাবের এই দুর্লভতা-

প্রযুক্ত ভাবপ্রিয় লোকেরা ভাবুকতা-প্রবণ হইয়া উঠেন, কিসে ভাব পাইব এই ভাবিয়া অস্থির হন, অন্ধভাবে ছুটাছুটি করেন। যাঁহারা তত ভাবপ্রিয় নহেন, তাঁহারা ভাবের অভাবে ক্রমশঃ শুষ্ক ও নীরস হইয়া পড়েন। কালক্রমে পরোক্ষ উপাসনা ভারবোঝা স্বরূপ হইয়া উঠে। অটলহৃদয় লোকেরা কর্ত্তব্য বোধে ইহা ধরিয়া থাকেন, কোমল হৃদয় লোকেরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া হয় একেবারে উপাসনাবিহীন হইয়া পড়েন, না হয় কোন কৃত্রিম সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ উপাসনার সঙ্গে ভাবের নিত্য, অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ। প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব উপলব্ধি করিবামাত্র হৃদয় ভাবাবেশে ডুবিয়া যায়, ভাব আনিবার জন্য কোনও প্রয়াস পাইতে হয় না, কোনও মানসিক কি অধ্যাত্মিক ব্যায়াম করিতে হয় না। প্রত্যক্ষ উপাসক ভাবের এই সুলভতা দেখিয়া ভাবের জন্য অস্থির হন না, ছুটাছুটি করেন না। তিনি দেখিয়াছেন ভাব দর্শনের নিত্য সখী; দেখিলে এত ভাব হয় যে ভাবের বেগ সম্বরণ করাই দুরূহ হইয়া পড়ে। তাই তিনি সর্ব্বদা দেখিবার জন্যই ব্যস্ত হন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাসনার প্রভেদ আমরা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। এখন প্রশ্ন এই, এই পরম কল্যাণকর প্রত্যক্ষ উপাসনা কি রূপে সাধন করা যায়? এই বিষয়ে আমার যাহা কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাহা এই ;—

১। ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যত্নবান্ হইতে হইবে। অনেক

ব্রাহ্ম আছেন, অনেক পুরাতন ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহাদের জীবন দেখিলে, যাঁহাদের জীবনে অনুসন্ধিৎসার অভাব দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা যেন মনে করেন তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার নাই, অবশ্য জ্ঞাতব্য যাহা কিছু সমস্তই জানা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি করিলে এবং একটী উচ্চ আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান একটী জীবন্ত বস্তু। ইহার প্রভাব বাহিরে প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান এমনই পদার্থ যে, ইহা গভীর ভক্তি ও জীবন্ত কার্য্যকারিতাতে পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, অথচ জীবনে বিশেষ তেজ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, তাঁহারা আত্ম-প্রতারিত। "বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্ ভবতি জগতামস্য সৌম্যরূপম্। ক্ষিতিরসমতিতরক্ষাত্ম-নোসন্তঃ কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ॥" সনাতন যাহার হৃদয়ে বসতি করেন, জগতের সমক্ষে তাহার সৌম্যরূপ প্রকাশিত হয়; যেমন ক্ষুদ্র শালবৃক্ষে বৃত্তিকা রসের আধিক্য হইলে উহার সৌন্দর্য্য দ্বারাই তাহা প্রতীত হয়। যাহা হউক এই জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে একটী কুসংস্কার আছে। সে কুসংস্কারটী এই;—"ঈশ্বরতত্ত্ব তো আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, সহজ-জ্ঞান-ঘটিত সত্য, ইহা লাভের জন্য গভীর জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন কি?" এই কথার মধ্যে একটী ভ্রম আছে; ঈশ্বর-বিশ্বাস যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, ইহা যে একটী সহজজ্ঞান-ঘটিত সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ হইলেও

এই বিশ্বাস প্রকৃতরূপে লাভ করিবার জন্য জ্ঞানালোচনা চাই। দেখিতেছ না ভাই, ঈশ্বর-বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ হইলেও সময়ে সময়ে তুমি ঈশ্বর বিষয়ে সন্দিহান হও, ইহা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ হইলেও অন্যান্য বিশ্বাসের ন্যায় ইহা তোমার নিকট উজ্জ্বল নহে? ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ, ইহা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ হইলেও তুমি অলস, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পার না। ঈশ্বরে যখন তুমি অবিচলিত উজ্জ্বল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছ না, তখনই তোমার বুঝা উচিত যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস তোমার প্রকৃতির মূলে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, এবং আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি এখনও তাহা ধরিতে পার নাই, তাহা এখনও তোমার নিকট লুক্কায়িত অপ্রাপ্ত বস্তু হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত আত্মপ্রত্যয় হৃদয়ে উদিত হইলে তাহাতে উজ্জ্বল অনতিক্রমনীয় বিশ্বাস হইবেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ হওয়া অসম্ভব। সেই উজ্জ্বল আত্মপ্রত্যয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে নিরস্ত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। গভীর জ্ঞানালোচনা দ্বারা প্রজ্ঞা-চক্ষুকে মার্জ্জিত করিয়া হৃদয়-নিহিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয়সমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এই জ্ঞান সাংসারিক জ্ঞান নহে, বাহিরের পদার্থবিজ্ঞানও নহে। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ আত্মজ্ঞানে। সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। কিন্তু পদার্থ-জ্ঞানের যে প্রণালী, আত্মজ্ঞানের প্রণালীও অনেকটা সেইরূপ। অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য, পরিদর্শন, চিন্তা, বিচার ব্যতীত যেমন পদার্থজ্ঞান লাভ করা যায় না, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ। আত্মজ্ঞান লাভের জন্যও আচার্য্যের উপদেশ, আত্মদর্শন,*

আত্মচিন্তা ও আত্মবিচার আবশ্যক। হায়, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কি দারুণ ভ্রম! আমরা মনে করি আমরা আপনাকে বেশ জানি, কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। আত্মজ্ঞানে কিঞ্চিৎ অগ্রসর না হইলে এই ভ্রম দূর হয় না। যাহা হউক, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় যে, আত্মজ্ঞানে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ব্রহ্মতত্ত্ব ততই উজ্জ্বলতর হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ; আমরা জীবাত্মাকে দেখি না, তাই ব্রহ্মকেও দেখি না। জীবাত্মাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে গিয়া ব্রহ্মকে না দেখা অসম্ভব। জীবাত্মার সমুদায় বৃত্তি ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত, জীবাত্মার প্রত্যেক প্রাণ-বিন্দু ব্রহ্মসাগরে ধৃত, অবস্থিত। আত্মদর্শন করিতে গিয়া ব্রহ্মের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিয়া মন ভাবে বিভোর হইয়া যায়।

২। উপাসনা সম্বন্ধে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করিয়া কখনও উপাসনা শেষ করিব না। প্রত্যক্ষ উপাসনা না হইলে আমার চলে না, এরূপ স্পষ্ট ধারণা চাই। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রত্যক্ষ উপাসনার সাধন করা চাই। পরোক্ষ উপাসনা করিয়া করিয়া এরূপ মন্দ অভ্যাস হইয়া যায় যে, তাহাতেই হৃদয় একপ্রকার তৃপ্ত থাকে; তাহাতেই জীবন চলিয়া যায়। কিন্তু সে জীবন কি জীবন যাহাতে ঈশ্বরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই? সে জীবনকে জীবন না বলিলেই কি নয়? এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই, অটলতা চাই। যদি অনেক যত্ন করিয়াও এক সময়ে প্রত্যক্ষ উপাসনা সম্ভোগ করিতে না পারি, যদি বাধ্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়, লক্ষ্য থাকা উচিত যে, কার্য্য

হইতে অবকাশ পাইলেই পুনরায় প্রত্যক্ষ উপাসনা সম্ভোগের জন্য যত্ন করিব। প্রত্যক্ষ উপাসনা না হইলে আমার চলে না, আমি প্রত্যক্ষ উপাসনা না করিয়া অন্ধভাবে অসার ভাবে জীবন কাটাইব না, এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প চাই। ঈশ্বর এরূপ ব্যাকুল সাধকের নিত্য সহায়।

৩। জীবনকে যতদূর সম্ভব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কোলাহল হইতে মুক্ত করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হইতে হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করাই যখন সমুদায় ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবনের উৎস, তখন সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাই সাধন করিতে হইবে। এই সংসার-কোলাহলে পড়িয়া আত্মা সহজেই বহির্মুখী হইয়া যায়। ধর্ম্মসমাজ মধ্যেও আত্মাকে বহির্মুখী করিবার অনেক বিষয় আছে। কোনও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিব না, অথচ অসংযত ও যোগবিহীন হৃদয়ে কর্ত্তব্য করিতে গিয়া যেন আত্মহারা না হই। কার্য্য-কোলাহল মধ্যে তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি জাগ্রত রাখিতে হইবে, এবং আত্মাতে ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে হইবে। যখনই অবকাশ পাওয়া যায়, তখনই হৃদয়ে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে হইবে, আত্মাকে ধ্যানস্থ করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব, সর্ব্বদা ঈশ্বরালোচনা লইয়া থাকিতে হইবে। ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যত অধিক সময় সম্ভব, কাটাইতে হইবে। ঈশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব, আত্মার সহিত ঈশ্বরের নিত্য গাঢ় সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের গভীরতর সত্যগুলি কেবল জানিলে বিশেষ ফল হয় না, সর্ব্বদা আলোচনা না করিলে এই সকল সত্য অস্পষ্ট থাকিয়া যায়, অন্তরে ইহাদের উজ্জ্বল ধারণা হয় না। নিত্য ধ্যান, নিত্য আলোচনা, নিত্য

ধারণা দ্বারা ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইতে হইবে।

এস ভ্রাতা ভগিনীগণ, এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপাসনা সাধন করি। যদি বুঝিয়া থাক জীবনের গতি রুদ্ধ হইয়াছে, জীবন-নৌকা চড়ায় ঠেকিয়াছে, তবে অভ্যস্ত পরোক্ষ উপাসনা ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ উপাসনা সাধনে যত্নবান্ হও। এই প্রত্যক্ষ উপাসনাব্যতীত ব্রাহ্ম সমাজের পরিত্রাণ নাই। এস সকলে এই প্রত্যক্ষ উপাসনা সাধন করি, অল্প দিন যাইতে না যাইতেই ব্রাহ্মসমাজের চেহারা ফিরিয়া যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত দেবালয়ে পরিণত হইবে।

বিশেষ কৃপা। *

ঈশ্বরের প্রেমে বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের বীজ। শুষ্ক নীরস সাধনহীন জীবনের মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যায় তাহার মূলে ঈশ্বরের প্রেমে অবিশ্বাস বর্ত্তমান। ঈশ্বরের প্রেমে—তাঁহার অনুপম ব্যক্তিগত প্রেমে—উজ্জ্বল বিশ্বাস আছে, অথচ জীবন শুষ্ক, ভক্তিহীন, সাধনহীন, এরূপ লোক দেখি নাই, কখনও দেখিব বলিয়া আশঙ্কাও করি না। তাঁহার অনুপম প্রেমে উজ্জ্বল বিশ্বাস জন্মিলে প্রেমিক ও সাধনশীল হওয়া অপরিহার্য্য।

সে যাহা হউক, দেখিলে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতে হয় যে, ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের ভাব।

যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় মতেও বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর আমাদের সাধারণ পিতা মাতা, তিনি সাধারণ নিয়মে জগৎ পালন করিতেছেন, আমরা সাধারণ জীব বা মানব-মণ্ডলীর অঙ্গীভূত বলিয়া তাঁহার মঙ্গল নিয়মের ফলভোগ করিতেছি, তাঁহার সাধারণ নিয়মে জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছি—ইঁহারা এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাসে উপাসনা ও ধর্ম্মজীবন অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এরূপ বিশ্বাস ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার গাঢ় মধুর প্রেমের যোগ সংস্থাপন করিতে পারে না। এরূপ ক্ষীণবিশ্বাসী, বৌদ্ধ ব্রাহ্মদিগের উপরে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের এই সাধারণ কৃপা হইতে পৃথক্ আর এক প্রকার বিশেষ কৃপা আছে, যাহা সময়ে সময়ে আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়। আমরা যে সূর্য্যালোক ভোগ করি, বায়ু সেবন করি, জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করি, বিবেকের আদেশ পাই, এই সমস্ত ঈশ্বরের সাধারণ কৃপার ফল। কিন্তু যখন আমরা কোন বিশেষ লাভে লাভবান্ হই, যখন কোন বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাই, যখন জীবনের কোন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে প্রার্থনা দ্বারা বিশেষ আলোক লাভ করি, তখন জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা কার্য্য করে। এরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ইহাও জীবনকে উচ্চতর সাধনের রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না। এরূপ বিশ্বাসিগণ এই সকল বিশেষ ঘটনা স্মরণ করিয়াই ঈশ্বরের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ হন। সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী তাঁহাদের হৃদয়কে প্রেমে

বিগলিত করিতে পারে না। বিশেষ ভাবে প্রেমে মগ্ন হইতে হইলে তাঁহাদিগকে জীবনের এই সকল বিশেষ ঘটনা স্মরণ করিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে এরূপ বিশেষ ঘটনা অপেক্ষাকৃত অল্পই ঘটে। সুতরাং এরূপ বিশ্বাসীদিগকে অনেক সময়ই শুষ্কতা ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ একবার সাধারণ কৃপা মানিলে বুদ্ধি অনেক সময়ই এই সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে সাধারণ কৃপার মধ্যেই লইয়া ফেলিতে চায়। বুদ্ধি অনেক সময়ই বলে, যদি সাধারণ নিয়ম বলিয়া কিছু থাকে তবে এই সমস্ত বিশেষ ঘটনা কি সেই সকল সাধারণ নিয়মের ফলমাত্র নহে? বিজ্ঞান বুদ্ধির এই সংশয়কে পোষণ করে। এইরূপে সাধারণ কৃপাবাদীকে অনেক সময়ই সংশয়ের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে হয়। এক সময় এই সাধারণ কৃপার মত মানিতাম। বহুকালব্যাপী পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছি, এই মত কোন প্রকারেই মধুর যোগ ভক্তির অনুকূল নহে। চলনসই ধর্ম্মের সাধকেরা এরূপ বিশ্বাসে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন; শুষ্ক নীতিবাদী কর্ম্মীরা ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া, অথবা নিয়ম রক্ষার্থ তাঁহার সহিত দুই একটী ভদ্রতার কথা বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-পিপাসু আত্মা এইরূপ বিশ্বাস লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। পিপাসু আত্মা তাঁহাকে দেখিতে চায়, তাঁহার কথা শুনিতে চায়, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে চায়, তাঁহার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে চায়, তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিতে চায়, নিত্য নিত্য, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ, তাঁহার বিশেষ কৃপা, অনুভব করিতে চায়।

কিন্তু ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; এরূপ বিশ্বাস বড়ই দুর্ল্লভ বস্তু। নিজের কথা বলিতে পারি, অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা কেবল পিপাসার বিষয় ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা আদর্শ মাত্র ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই সত্য অগ্রাহ্য করিতাম না, অবিশ্বাস করিতাম না, প্রত্যুত ইহাকে যত্নের সহিত পোষণ করিতাম; কিন্তু তখনও জ্ঞান ইহাকে অপরিহার্য্য বলিয়া ধারণ করে নাই; ইহা যে একটী অনতিক্রমণীয় ধ্রুব সত্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্যকে অগ্রাহ্য না করা, অবিশ্বাস না করা, একটী মত মাত্র বলিয়া পোষণ করা এক কথা, আর ইহাকে অপরিহার্য্য অনতিক্রমনীয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা, ও সংসারসাগরের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে ইহাকে অচল শৈলরূপে ধারণ করিয়া থাকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এই অবস্থা আমার পক্ষে এখনও আদর্শ, কিন্তু এ সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোক পাইয়াছি, তাই এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য দিতে, দুই একটী কথা নিবেদন করিতে, প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আত্মজ্ঞানের আলোকে জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ দর্শন করিলে এই বিষয় অনেক পরিষ্কার হইয়া যায়, এই বিষয়ক বিশ্বাস ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য যে, এই সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, গভীর চিন্তা ও ধ্যান আবশ্যক। যাঁহারা এরূপ জ্ঞানকে কেবল শুষ্ক দার্শনিক জ্ঞান বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত ইহার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ

বুঝিতে না পারিয়া ইহার সাধনে উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের নিত্য প্রেম, নিত্য লীলা সম্বন্ধীয় উচ্চতর সত্য সমূহ চিরদিনই অস্পষ্ট ও সন্দেহাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, কেবল স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আত্মচিন্তাদ্বারা আত্মার সহিত ঈশ্বরের নিত্য নিগূঢ় যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহার অনুপম প্রেমের তত্ত্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্মজ্ঞান কি দেখাইয়া দেয়? আত্মজ্ঞান দেখাইয়া দেয় যে, জাগরণ, বিস্মৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সমুদায় অবস্থাতে আমার জীবন ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিতেছে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত রহিয়াছে। আমি জীবনের কোনও কালেই, কোনও অবস্থাতেই কোন অন্ধ জড়-শক্তির অধীন নহি; সর্ব্বকালে, সকল অবস্থাতে তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছি। আমার নিজেরও এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাঁহা হইতে প্রাপ্ত নহে, তাঁহাতে ধৃত ও অব-স্থিত নহে। এই যে উপাসনামন্দিরের দৃশ্য আমার সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে, এই দৃশ্য, এই চিত্র, পরমাত্মা স্বয়ং আমার চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছেন, এই দর্শন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আত্মা-ঘটিত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। শরীর দেখে না, জড়বস্তুও দেখাইতে পারে না, দেখে আত্মা, দেখায়ও আত্মা, দর্শন আত্মারই একটী অবস্থা মাত্র। এইরূপে দেখা যায়, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞানের ব্যাপারই আত্মা-ঘটিত ব্যাপার, আত্মায় আত্মায় সংঘর্ষণ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লীলা। আত্মাতে জ্ঞান-লীলা কেবল তিনিই করিতে পারেন, যিনি আত্মার ভিতরে আছেন, আত্মা যাঁহার হাতে আছে, আত্মা যাঁহার লীলার পুতুল। পুনরায়, যখন

আমাদের জীবনের আর একদিকে তাকাই, যখন দেখি আমরা নিতান্ত বিস্মৃতিশীল, অথচ স্মৃতি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে, আমরা বিস্মৃতিশীল হইলেও আমাদের জীবন সচ্ছন্দে, চলিয়া যাইতেছে, তখন আত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। এই যে আমরা এই মন্দিরে বসিয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিতেছি, এই সময়ে আমরা জীবনের কত কথা ভুলিয়া আছি। এক্ষণে, একদিকে দেখিতে গেলে, আমাদের সমস্ত পূর্ব্বজীবন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বলিতে বলিতেই আবার বিস্মৃত কথাগুলি, হারাণ বিষয়গুলি স্মরণে আসিতেছে, সংসারে প্রবেশ করিলে যথাসময়ে সমুদায়ই মনে পড়িবে। এইরূপে আমরা ক্ষণে ক্ষণেই বিস্মৃত হইতেছি, ক্ষণে ক্ষণেই আবার স্মৃতি লাভ করিতেছি। বিস্মৃতিকালে পূর্ব্বজীবনের ব্যাপার সমূহ কোথায় যায়, কোথা হইতে আবার ফিরিয়া আসে, কেইবা আনিয়া দেয়? এই সকল ভাবিলে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে বিস্মৃতিশূন্য নিত্য সাক্ষী পরমাত্মা এই সমুদায় ধারণ করিয়া থাকেন ও প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি আত্মার কত নিকটে, তাঁহার সহিত আত্মার কি গাঢ় যোগ! আত্মা নিশ্চয়ই তাঁহার লীলার পুতুল। আবার যখন নিদ্রিত হই, অচেতন হই, একেবারে অবশ, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি,—জ্ঞান, স্মৃতি, বুদ্ধি, শক্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলি, তখন আত্মা কাহার আশ্রয়ে স্থিতি করে? সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় কে জীবনের হারাণ বিষয়গুলিকে যত্নের সহিত রক্ষা করে? কেই বা যথাসময়ে জাগ্রত করে এবং জীবনের হারাণ বস্তুগুলিকে প্রত্যর্পণ করে? না জাগা ত

অতি সহজ হইত, জাগি কেন? জাগায় কে? জাগিলেও তো পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ফিরাইয়া না পাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত জীবন আবার শিশুর অজ্ঞান অবস্থায় পরিণত হইত। কে যত্ন করিয়া সমুদায় প্রত্যর্পণ করে,—আবার জীবনলীলা খেলিতে থাকে? তিনিই,—সেই নিদ্রাশূন্য চির-জাগ্রত পুরুষই, যিনি আত্মার নিত্য আশ্রয় ও অবলম্বন, আত্মা যাঁহার লীলার পুতুল। এইরূপে দেখিতে পাই, প্রত্যেক আত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। জীবন ধারণের জন্য, জীবনের উন্নতির জন্য, যে যে উপকরণ আবশ্যক, সমস্ত তিনি সাক্ষাৎভাবে প্রত্যেক আত্মাকে প্রদান করিতেছেন। জ্ঞান, ভাব, শক্তি যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত, এই সমস্ত আমাদের নিজায়ত্ত নহে, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে আমাদিগকে এই সমস্ত দিয়া জীবিত রাখিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাত্মা, প্রত্যেক মানবজীবন তাঁহার অবিরাম নিত্য লীলার ক্ষেত্র। এই বিশেষ বিশেষ লীলাক্ষেত্রের সমষ্টির নামই জগৎ।

আত্মাতে প্রকাশিত এই দিব্যজ্ঞানের আলোকে যখন ঈশ্বরের প্রেম মুখ দেখি, তখন একেবারে অবাক্ হইয়া যাই, মুগ্ধ হইয়া যাই। তখন বুঝিতে পারি ঈশ্বরের সাধারণ কৃপা একটা কথার কথা মাত্র। ঈশ্বর সাধারণ ভাবে আমাদিগকে কৃপা করেন, ইহা বলিলে ঈশ্বরেতে মানুষের অসম্পূর্ণতা আরোপ করা হয় মাত্র। অথবা যদি সাধারণ কৃপার কোন অর্থ থাকে, সে কেবল এই মাত্র যে, বিশেষ কৃপার সমষ্টিকে এক অর্থে সাধারণ কৃপা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর সাধারণ নিয়মে কার্য্য

করেন, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সহিত আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ সম্বন্ধ প্রকৃত পক্ষে সাধারণ হইয়া যায় না। তিনি সাধারণ নিয়মে কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ। তিনি প্রত্যেক আত্মার সহিত বিশেষ ভাবে নিত্য লীলা করিতেছেন। জীবনের সমুদায় ঘটনাই তাঁহার বিশেষ কৃপার ফল। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত, সায়ংকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, সমস্ত দিন রাত্রি তিনি হৃদয়ক্ষেত্রে, জীবনক্ষেত্রে প্রেম-লীলা করেন। তিনিই সকলকে স্বয়ং জাগ্রত করেন, তিনিই প্রাতঃকালীন নাম-জপ, নাম-কীর্ত্তনের জন্য প্রাণকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রাতঃকালীন্ শীতল বায়ু সেবনার্থ ডাকিয়া বাহিরে লইয়া যান, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপারূপী শীতল জলে স্নান করান, তিনিই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রসাদরূপী অন্ন আহার করান। তিনি আহার করান ইহা কি কবিত্ব? আমি আহার করি ইহাই কি কেবল সত্য? কে বলিল? তিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়া অন্ন না দেখাইলে আমি দেখিতাম না, তিনি অন্নের আধাররূপী হইয়া না থাকিলে অন্নের এক কণিকাও থাকিত না, আর তিনি আমার শরীরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বল না দিলে আমার আহার পান সমুদায় কার্য্যই অসম্ভব হইত। স্থূলদর্শী অবিশ্বাসীর চক্ষে যে সকল ব্যাপার কেবল ভৌতিক, কেবল মানুষিক বলিয়া বোধ হয়, স্থূলদর্শী যে সমুদায় কার্য্যে কেবল পাচককে দেখেন, পরিজনকে দেখেন, কতকগুলি অচেতন বস্তু দেখেন, সূক্ষ্মদর্শী বিশ্বাসী সেখানে ব্রহ্মের জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া ভাবে ডুবিয়া যান। এইরূপে তিনি আমাদিগকে পোষণ

করেন। তিনি স্বয়ং শরীরে থাকিয়া অন্নপাক, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তিনি স্বয়ং কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, শরীর মনে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া আমাদিগকে কার্য্য করান। তিনি শরীরের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে চিরসংযুক্ত থাকিয়া যেখানে যাই নিত্য সঙ্গী হইয়া আমাদের সহিত বিচরণ করেন ও দৈনিক শত শত বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনিই পরিশ্রমান্তে প্রাণে বিশ্রাম ও শান্তি দান করেন। তিনিই জ্ঞানোপার্জ্জন কালে চক্ষুর চক্ষু হইয়া দেখান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত করেন। তিনিই প্রাণকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন, তিনি হাত যোড় করান, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করান, তিনি মনকে শান্ত করেন, তিনি সত্য প্রেম পবিত্র স্বরূপ হইয়া নিজ গুণে আত্মাতে প্রকাশিত হন, প্রেম শান্তি রসে প্রাণকে অভিষিক্ত করেন, পুণ্যবলে আত্মাকে বলীয়ান্ করেন। তিনিই বিবেকরূপে নিয়ত আত্মাতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, ইহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, পুণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন, নিয়ত ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া স্বর্গ রাজ্যের দিকে প্রলুব্ধ করেন। তিনিই আমাদিগকে সাধু ভক্তদিগের নিকট লইয়া যান, শ্রোত্রের শ্রোত্র হইয়া তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণ করান, মনকে বুঝান, এবং প্রাণে ঐ সকল উপদেশের ভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই দেশ কালের ব্যবধান চূর্ণ করিয়া আত্মাকে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের অরণ্যমধ্যস্থিত ব্রাহ্ম সমিতিতে লইয়া গিয়া গভীর তত্ত্বকথা শ্রবণ করান, বোধি-বৃক্ষমূলে গভীরধ্যানমগ্ন

হৃদয়মুগ্ধকর বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করান, কেনানের পর্ব্বতোপরি আসীন মহর্ষি ঈশার পবিত্র স্বর্গীয় উপদেশ শ্রবণ করান, ক্যাল্‌ভ্যারির বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া সেই প্রাণস্পর্শী, অদ্ভুত আত্মসমর্পণের ব্যাপার দর্শন করান, প্রাচীন নবদ্বীপে প্রেমোন্মত্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে নৃত্য করান। এইরূপে প্রাচীন ও আধুনিক অসংখ্য প্রেমিক, জ্ঞানী ও কর্ম্মী সাধকের সহবাসে লইয়া গিয়া আত্মাকে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করান, পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করেন। আমি আমার নিজের জন্য যত ব্যস্ত সে ব্যস্ততাকে কোটি গুণ করিলেও তাঁহার ব্যস্ততার সমান হয় না। সাধারণত্ব কোথায়? সবই বিশেষ। আমার সমগ্র জীবন তাঁহার বিশেষ কৃপার লীলা-ক্ষেত্র। আমি তাঁহার বিশেষ কৃপার সাগরে অনুক্ষণ ডুবিয়া আছি; যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু পাই, যাহা কিছু সম্ভোগ করি, যাহা কিছু সহ্য করি, সমুদায় তাঁহার এই বিশেষ কৃপা সাগরের তরঙ্গ। সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, সংসার, গৃহ, পরিজন, বন্ধু, সমাজ, সদ্‌গ্রন্থ, সাধু, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি সমুদায়ই তাঁহার বিশেষ কৃপাসাগরের তরঙ্গ। আমি নিয়ত তাঁহার প্রেমসাগরে ভাসিতেছি। তাঁহার কৃপা অনন্ত, অসীম, অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার কৃপা সম্পূর্ণরূপে জানি না বলিয়া বাঁচিয়া আছি। ভাল রূপে জানিলে, অনুভব করিলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন কিঞ্চিৎ দেখি, যখন দেখি আমি কি পাষণ্ড, নরাধম, কৃতঘ্ন, তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সংসারের অসার বস্তু লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি, অপরদিকে তিনি আমার মস্তকে করুণার উপর

করুণা চাপাইয়া আমাকে একেবারে প্রেমঋণে ডুবাইয়া দিতেছেন, তখন হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন প্রাণ সরল ভাবে বলে,—"তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারিনে গো আর; প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে, লইনু শরণ মাগো অভয় চরণে।" কবে তাঁহার প্রেম জানিয়া, তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া প্রেমিক হইব, শুষ্কতা চিরদিনের মতন চলিয়া যাইবে!

কবে—

'প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব;
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার!'

দয়াময় শীঘ্র সেই শুভ দিন আনয়ন করুন।

বিধানতত্ত্ব।*

এক প্রকার সঙ্কীর্ণ গভীরতাশূন্য একেশ্বরবাদ আছে যাহা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উদার সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে তাহা অনেক অংশে ভিন্ন। উক্ত একেশ্বরবাদকে ইংরেজিতে Deism বলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য এই যে, ইহা ঈশ্বরকে সৃষ্টিস্থিতিপালন-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াও জগৎকে কতিপয় অন্ধশক্তি ও

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরে প্রদত্ত উপদেশের ভাব।

নিয়মের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরকে নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক কাল হইতে নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরবাদের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে উভয়তঃ আমাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে এই নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরবাদের প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা যে পরিমাণে জগৎ এবং মানবজীবনকে ঈশ্বর-বিচ্যুত ও অন্ধশক্তি বা নিয়মের অধীন বলিয়া কল্পনা কবি, সেই পরিমাণে আমরা উক্ত ভ্রান্ত মতের অধীন। উক্ত মত কেবল একটী বুদ্ধিঘটিত ভ্রান্ত মত নহে, উহা একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা—উহা অবিশ্বাস বা অল্প বিশ্বাসের অবস্থা। যে পরিমাণে আমরা বিশ্বাস সম্বন্ধে হীন সেই পরিমাণে আমরা উহার অধীন। আর যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সত্যতা ও একাধিপত্যে বিশ্বাসী হই, সেই পরিমাণে উহার হাত হইতে মুক্ত হই।

ঈশ্বরের প্রকাশ ত্রিবিধ :—বাহ্য জগতে, আত্মাতে ও ইতিহাসে। এই ত্রিবিধ প্রকাশ সকলের নিকট সমানরূপে উজ্জ্বল নহে। কেহ কেহ বাহ্য জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ অনেকটা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পান, কিন্তু আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারেন না, অথবা বুঝিয়াও ধারণা করিতে পারেন না। কেহ কেহ বা বাহ্যজগতে ও আত্মার মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব অনেকটা উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পান, কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার কিরূপ আবির্ভাব তাহা বুঝিয়াও ধারণা করিতে পারেন না, অথবা তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কিন্তু ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ আবির্ভাবই পরিষ্কার

রূপে বুঝা, উজ্জ্বলরূপে ধারণা করা এবং যত্নের সহিত সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ। আমরা যে পরিমাণে এই উদার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হই, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জীবনে অঙ্গহীন থাকে, সেই পরিমাণে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলেচ্ছা অসম্পন্ন থাকে।

অদ্য ইতিহাসে ঈশ্বরাবির্ভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এস্থলে ইতিহাস বলিতে—ব্যক্তিগত মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ সমষ্টি; যথা, বিশেষ বিশেষ জাতি। আবার, যে ব্যক্তিগত জীবনের সহিত মানব-সমষ্টির বিশেষ সম্বন্ধ, যে ব্যক্তিগত জীবন বিশেষ বা সাধারণ মানব-সমষ্টির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত জীবন হইলেও ইতিহাসেরই অন্তর্গত। ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন কেবল ব্যক্তিগত জীবন নহে, ইঁহাদের এক একটী জীবন এক একটী বিচিত্র ইতিহাস। ইঁহারা যে জগতে আসিয়াছিলেন, সে কেবল নিজের জন্য নহে, কেবল অল্প সংখ্যক পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের জন্য নহে, যে দেশ বা জাতিতে ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল সেই দেশ বা জাতির জন্যও নহে; ইঁহারা জগতে আসিয়াছিলেন জগতের জন্য। সমগ্র মানবজাতির সহিত ইঁহাদের জীবনের নিকট সম্বন্ধ। ইঁহারা যে সময়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে হয়ত ইঁহাদের প্রভাব অধিক দূর বিস্তৃত হয় নাই; কিন্তু জ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের জীবনের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে, এবং নিঃসন্দেহ এককালে সমগ্র পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাহাতেই বলি

ইঁহারা জগতের জন্য আসিয়াছিলেন; ইঁহাদের জীবন সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি—ইঁহাদের জীবন মানবের উন্নতির সাহায্যার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান।

আত্মাতে ঈশ্বরাবির্ভাব,—প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ—বুঝিতে পারিলে বিধানতত্ত্ব অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ঈশ্বর আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার নিত্য আশ্রয় ও অবলম্বন, আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছি, তাঁহা হইতে আমাদের জীবনস্রোত—আমাদের জ্ঞান, প্রীতি, শক্তি, পবিত্রতা—নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে—এই তত্ত্ব উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিলে, যাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ বলি, তাঁহাদিগের জীবনে ঈশ্বরাবির্ভাব, তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। একদিকে তাঁহাদিগের সহিত সাধারণ মানবের কিছুই পার্থক্য নাই। তাঁহারা যেমন ঈশ্বরাশ্রিত, ঈশ্বরানুগৃহীত, সাধারণ মানবও তেমন ঈশ্বরাশ্রিত, ঈশ্বরানুগৃহীত। সাধারণ মানবের সমস্ত গুণের প্রস্রবণ যেমন তিনি, অসাধারণ গুণশালী মনুষ্যের সমস্ত গুণের প্রস্রবণও তেমনি তিনি। আমাদের জীবন যেমন ঐশ্বরিক বিধান, তাঁহাদের জীবনও তেমনি ঐশ্বরিক বিধান। তাহার পর তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ মানবের যে যে স্থলে প্রভেদ, সে স্থলেও উজ্জ্বলরূপে ঈশ্বরাবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ মনুষ্যের সঙ্গে মহাপুরুষদিগের প্রভেদ কেবল গুণের পরিমাণে। মহাপুরুষগণ তাঁহাদের স্বজাতীয়দিগের অপেক্ষা অথবা সাধারণ মানবমণ্ডলী অপেক্ষা জ্ঞানে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে বা শক্তিতে গরীয়ান্। যাহাতে

মানবের মানবত্ব, তাহা সাধারণ মানব অপেক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকতর। কিন্তু যাহাতে মানবের মানবত্ব, তাহাতেই আবার ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। যাহা মানবকে গৌরবান্বিত করে, তাহাই ঈশ্বরের মুখকে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত করে। জ্ঞান, প্রীতি ও পবিত্রতাতে যেমন মানবের মানবত্ব, তেমনি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। সুতরাং মানুষ যতই মহৎ হয়, ততই তাহার মধ্যে ঈশ্বর উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হন। এই অর্থেই সাধারণ মানব জীবন অপেক্ষা ইতিহাসে,—মহাপুরুষদিগের জীবনে ঈশ্বর উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত।

তৃতীয়তঃ, যে প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারি সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, শস্য, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি বস্তু, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, পিতা, মাতা, পরিজন, বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ বিধান, সেই প্রমাণ দ্বারাই—সেই প্রমাণের বরং উজ্জ্বলতর প্রয়োগে—বুঝিতে পারি বুদ্ধদেব, ঈশা প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন জগতের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ বিধান। এই বিষয়ের প্রমাণ অতি উজ্জ্বল; মার্জ্জিত চক্ষুতে তাকাইলে এই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। মহজ্জীবনেও নীচতার আভাস দেখিয়া, সাধুজীবনেও অসাধুতার নিদর্শন পাইয়া কি সন্দিগ্ধ হও যে, সেখানে ঈশ্বর আবির্ভূত কি না? এই সন্দেহ বাহ্যজগৎ ও মানবাত্মার সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে খাটে। জগৎ ও মানবাত্মা অসম্পূর্ণ, দোষ-মিশ্রিত হইয়াও যদি ঐশ্বরিক বিধান হয়, ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র হয়, তবে মহজ্জীবন দোষ-মিশ্রিত বলিয়া তাহার বিধানত্বের কি হানি হইল? যাহা কিছু মহৎ,

যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র—সংক্ষেপতঃ যাহা কিছু ভাবাত্মক, তাহাই ঈশ্বরসম্ভূত, তাহাই ঈশ্বরের প্রকাশ। আর অন্ধকার, কদর্য্যতা, অপবিত্রতা প্রভৃতি যাহা কিছু অভাবাত্মক তাহাই জীবের ভাব, সৃষ্টবস্তুর ভাব,—নিত্য সত্য বস্তুর ছায়া। ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরোক্তিরূপে কথিত হইয়াছে—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্‌॥ ১০।৪১।

যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যবান্‌, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রভাবশালী তৎসমুদায়ই তুমি আমার তেজাংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে।

এখন দেখা যাউক এই সকল মহজ্জীবনরূপ বিধান যে জগতে আসে, তাহা কিরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং এই সকল বিধান সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? বিধানের দুই উদ্দেশ্য, (১) নূতন সত্যের প্রকাশ, (২) নবজীবন-সঞ্চার। নূতন সত্যের অর্থ এস্থলে কেবল সেই সত্য নহে যাহা পূর্ব্বে কেহ কোথাও কখনও জানে নাই, শুনে নাই। নূতন সত্য বলিতে সেই সত্যও বুঝিতে হইবে, যে সত্য দেশের মধ্যে পাঁচ জন লোক জানে কিন্তু পাঁচ লক্ষ লোক জানে না। নূতন সত্য বলিতে সেই সত্যও বুঝিতে হইবে, যে সত্য লোকে জানিয়াও ভুলিয়া যায়, পাইয়াও হারাইয়া ফেলে। এবং নূতন সত্য বলিতে সেই সত্যও বুঝিতে হইবে, যে সত্য মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে নিহিত থাকে, লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন্ত বাণী শুনিলেই নিতান্ত আত্মীয় ও নিকটস্থ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয়,—যে সত্য হৃদয়কন্দরে নিদ্রিত থাকে, কেবল বিশ্বাসীর ঢক্কাধ্বনি তুল্য গম্ভীর স্বর

শুনিলেই জাগ্রত হয়। মহাত্মগণ এই সকল অতি প্রাচীন অথচ নূতন সত্য প্রকাশিত করেন; কেবল অন্ধভাবে বিশ্বাস করান না—প্রজ্ঞাচক্ষু, বিবেকচক্ষু খুলিয়া দেখাইয়া দেন এবং তাঁহাদের স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ জীবনদ্বারা মানবহৃদয়ে এই সকল সত্যপালনোপযোগী বলের উদ্রেক করিয়া দেন। "সংসারের সুখ অসার, এবং নিত্য সত্য বস্তুই শান্তির অক্ষয় আধার" এই সত্য ভারত পূর্ব্বেও শুনিয়াছিল। কিন্তু যখন কিশোর-বয়স্ক রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন, রাজবিলাস, রাজ-বৈভবকে অসার জ্ঞান করিয়া বনগামী হইলেন, ও বহুবর্ষ-ব্যাপী কঠোর তপস্যা ও গভীর ধ্যানদ্বারা সেই নিত্য ধন অন্বেষণ ও লাভ করিলেন, তখন সেই প্রাচীন সত্য নবভাবে, নব আলোকে, নব বলের সহিত মানবের সমক্ষে উপস্থিত হইল। শত্রুকে ক্ষমা করা উচিত, ইহা জগৎ বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, প্রাচীন ইহুদীদের নিকটেও ইহা নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু যখন সেই ক্ষমার অবতার ঈশা ক্রুশ কাষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিষম যন্ত্রণানিপীড়িত শরীরে নৃশংস ঘাতক-দের জন্য প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না," তখন জগতের লোক মানবজীবনে ঐশ্বরিক ক্ষমাগুণের আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিয়া অবাক্ হইল, নীরবে অশ্রুপাত করিল। মানুষ যে ঈশ্বরের পুত্র তাহাত জগৎ জানিত। কিন্তু ঈশ্বরপুত্র বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইলেন তিনি, যিনি জীবনব্যাপী ঈশ্বরসেবার পর পুরস্কারস্বরূপ ভীষণ অপঘাত মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"পিতঃ, যদি সম্ভব হয়, তবে এই

বিষপাত্র অপসারিত কর, কিন্তু তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।” ঈশ্বরকে সাধ্বী সতীর ন্যায় প্রাণপতিরূপে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার বিরহ আত্মার অসহ্য হইবে, ইহা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সতীত্ব কাহাকে বলে, ঈশ্বরের বিরহ যন্ত্রণা কিরূপ, ইহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি তখনই, যখন চৈতন্যের জীবনরূপ উচ্ছ্বসিত তরঙ্গপূর্ণ প্রেমপারাবারের দিকে তাকাই। জ্ঞানীর উজ্জ্বল প্রজ্ঞাতে, যোগীর গভীর যোগে ঈশ্বরের সত্যভাবের যেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ, সেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোথায় দেখিব? বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিকার উদার প্রেমে, মানবের দুঃখনিবারণের জন্য দুঃসহকষ্টসহিষ্ণুতাতে ঈশ্বরের প্রেমব্যস্ততার, ঈশ্বরের মাতৃভাবের যেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ, সেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোথায় দেখিব? ভক্তের উচ্ছ্বসিত সুমধুর প্রেমে ঈশ্বরপ্রেমের মধুরতার যেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ, সেরূপ উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোথায় দেখিব? আর ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত, জ্বলন্ত অগ্নিতে, গভীর সাগরজলে, ভীষণ শ্বাপদ মুখে নিক্ষিপ্ত, অস্থিপর্শী ভীষণ যন্ত্রণা-পীড়িত ধর্ম্মবীরের জীবন্ত পবিত্রতার ন্যায় শ্বরের অনন্ত পবিত্রতার উজ্জ্বলতর প্রতিরূপ আর কোথায় দেখিব? এইরূপে পদে পদে দেখিতে পাই, সাধু ভক্ত মহাত্মাদিগের জীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ কত উজ্জ্বল!

এই সমুদায় জীবন্ত বিধান সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালনে আমরা নিতান্ত বিমুখ। আমরা অনেকেই মতে সেই সঙ্কীর্ণ নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরবাদ ছাড়িয়াছি; অনেক

কাল হইল ঈশ্বরের জীবন্ত বিধানকে মতরূপে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু বিধানবাদ কেবল মত মাত্র নহে, ইহা গভীর ঐকান্তিক সাধনের বিষয়। অথচ এই মহাসত্যের সাধনে আমাদের ভয়ানক শিথিলতা রহিয়াছে। এরূপ শিথিলতার ফল জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব, ভক্তির অভাব, উৎসাহের অভাব, অহঙ্কার, কৃতঘ্নতা, সাধুভক্তির অভাব ইত্যাদি। বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র বিধান রাজ্য হইতে দূরে থাকিয়া নিজের সঙ্কীর্ণ হৃদয়কুটীরে আবদ্ধ থাকিলে এরূপ আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়া কিছুই বিস্ময়কর নহে। এরূপ শিথিলতার বিশেষ কারণ বোধ হয় এই যে, ঈশ্বর-প্রেরিত বিধান সমূহের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না। এই সকল বিধান সাধারণ ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য আসিয়াছিল, এখনকার বিধান সমূহও সাধারণ ভাবে জগতের মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে, আমরা অনেকেই এই মাত্র বিশ্বাস করি। কিন্তু বাস্তবিক পূর্ণ সত্য এই যে, জগতে যত বিধান আসিয়াছে ও আসিতেছে, অন্ততঃ যত গুলি আমাকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, তৎসমস্তই আমার জীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত; আমার জীবনের উপর সেই সমস্ত গুলিরই বিশেষ দাবি আছে। আমি যাহা কিছু শুনি, যাহা কিছু জানি—সমস্তই আমার উপর ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কার্য্য। আমার সমস্ত জ্ঞানই ঈশ্বর-প্রেরিত জ্ঞান—ঈশ্বরানুপ্রাণনের ফল। এই যে ঈশ্বর আমার আত্মাতে জ্ঞান প্রেরণ করেন, এই জ্ঞানপ্রেরণের উদ্দেশ্য কেবল এই যে, আমি এই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিব, আত্মাতে প্রকাশিত এই সকল পরমতত্ত্ব ঐকান্তিক যত্নের সহিত সাধন করিব।

যে মুহূর্ত্তে শুনিলাম বিশ্বাসাবতার ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিয়াছেন, আর এই প্রাণদানের উদ্দেশ্য মানব জীবনে সত্যের জয় ঘোষণা, মানবের মুক্তি, সেই মুহূর্ত্তে বুঝিলাম, বা বুঝা উচিত যে, ঈশা অন্য আর যাহার জন্যই প্রাণ দিয়া থাকুন, আমার জন্য প্রাণ দিয়াছেন ইহা সুনিশ্চিত; এই অদ্ভুত লীলা আমার মুক্তির উদ্দেশে রচিত ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহা আমার মুক্তিপথের সহায়রূপে আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই পরমতত্ত্ব আমার শুনিবার আর কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তাঁহার উচ্চারিত মহান্ সত্য সমূহ যে মুহূর্ত্তে আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা আমার জীবনের উপর এক ভয়ানক দাবি বসাইল। যে পর্য্যন্ত আমি সেই সকল সত্যে সিদ্ধ না হই, সে সকল সত্য জীবনে পরিণত না করি, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট আমার নিষ্কৃতি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত নিম্নতর বিধি প্রচলিত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই বিধি অনুসারে চলিলেই যথেষ্ট। কিন্তু উচ্চতর বিধি প্রচলিত হইলেই, নিম্নতর বিধি অনুসারে চলা আর যথেষ্ট নহে। বুদ্ধদেব ও ঈশা প্রচারিত ধর্ম্মজীবনের আদর্শ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ যে ভাবে জীবন কাটাইলে বিবেকের নিকট অব্যাহতি পাইত, এই সকল উচ্চতর আদর্শ প্রচারের পর কখনও আর সেরূপে চলিলে অব্যাহতি পাইতে পারে না। উচ্চতর বিধানের আগমনে জীবনের দায়িত্ব গুরুতর হইয়া উঠে। এই রূপে দেখি, প্রত্যেক বিধানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের, অতি নিকট সম্বন্ধ। জ্ঞানিগণের সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞান আমারই জন্য, ভক্তগণের সাধিত, প্রচারিত ভক্তিরাশি আমারই জন্য,

জনহিতৈষী মহাত্মাদিগের গভীর মানবপ্রেম আমারই জন্য, পবিত্রাত্মাদিগের সিঞ্চিত পবিত্রতাজল আমারই পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্মবীরদিগের প্রকাশিত ধর্ম্মবল আমারই বলবিকাশের জন্য। উপনিষদের গভীর তত্ত্বজ্ঞান, পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের উজ্জ্বল ব্রহ্মবিদ্যা, খ্রীষ্টীয় বিধানের গভীর নির্ভর ও ঐকান্তিক সেবার ভাব, মহম্মদের জীবন্ত বিশ্বাস ও উৎসাহ, বৌদ্ধ বিধানের উদার প্রেম ও নির্ম্মল বৈরাগ্য, বৈষ্ণবগণের মধুর ভক্তি, বর্ত্তমান জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও গভীর যোগ, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের উদার মত ও উচ্চ সাধনের আদর্শ, পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাভগ্নীদিগের বিবিধ গুণাবলী এই সমস্তই আমার জন্য। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য বিধান আমাকে আহ্বান করিতেছেন। যে বিধানের দিকে তাকাই, সে বিধানই বলেন—আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার তত্ত্ব অবগত হও, উজ্জ্বল প্রজ্ঞা, নির্ম্মল বিবেকের সাহায্যে আমাকে পরীক্ষা কর, আমাকে সাধন কর, আমাকে জীবনে আয়ত্ত কর। বিধান সমূহ বিধানপতির মূর্ত্তিমতী করুণা; বিধানের আহ্বান আর কিছুই নয়, তাঁহার করুণার আহ্বান, তাঁহারই আহ্বান। বিধান অগ্রাহ্য করা, বিধানতত্ত্ব আলোচনা না করা বিধান জীবনে সাধন না করা, আর চিরব্যস্ত, হৃদয় দ্বারে দণ্ডায়মান, করুণাময়ী মায়ের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করা একই কথা।

সুতরাং বিধান সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। প্রথমতঃ, অহংকার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শিষ্যভাবাপন্ন হইয়া গভীর রূপে বিধানতত্ত্ব আলোচনা

করিতে হইবে। আমি ধর্ম্ম জগতে নিতান্ত শিশু, আমাকে এখনও অনেক জানিতে হইবে, এখনও অসংখ্য তত্ত্ব কথা শিক্ষা করিতে হইবে, মনে এই পরিষ্কার ধারণা লইয়া চিরদিনের জন্য ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ে নাম লিখাইতে হইবে। যে সমস্ত বিধানের তরঙ্গ অনেক দিন হইতে শরীরে লাগিতেছে, যে সমস্ত বিধানের স্রোত চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে, গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তাযোগে সেই সমুদায়ের মধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই আলোচনা-লব্ধ মহৎ সত্য সমূহ ঐকান্তিক যত্নের সহিত সাধন করিতে হইবে, জীবনে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মহৎ ব্রত সম্মুখে দেখিয়া কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়? অলস থাকা যায়? আর কি বৃথা গল্প করিবার সময় আছে? আর কি বাহিরের অসার কোলাহলে ব্যস্ত থাকিবার সময় আছে? এস, সব ছাড়িয়া সাধনে মন দিই, জীবন কৃতার্থ হউক।

যোগতত্ত্ব।

"জীবন্তধর্ম্মের লক্ষণ"-শীর্ষক প্রস্তাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যোগশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব। ধর্ম্মজগতে যোগ শব্দের অন্য অর্থ নাই। ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার এই যে ঘনিষ্ঠ, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, ইহা ভিন্ন আর যাহা কিছু যোগশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত পক্ষে যোগ বলা যায় না। তাহা শারীরিক প্রক্রিয়াবিশেষ মাত্র। তাহাতে চিত্ত সমাধানের, মনঃসংযমের কতদূর সাহায্য হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি

না। কিন্তু কোন শারীরিক ক্রিয়াবিশেষদ্বারা যে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, আমরা একথা বিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াকে চিত্তসমাধানের উপায় বলিয়া স্বীকার করিলেও, ঐ সকল প্রক্রিয়াকে যোগ বলা কিরূপে সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উহাকে যোগ বলাও যাহা, আর উপায়কে উদ্দেশ্য বলা, পথকে গন্তব্য স্থান বলাও তাহাই। এতদ্ভিন্ন আমরা এ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে হঠযোগদ্বারা মানুষ যে সমাধি প্রাপ্ত হয়, তাহা এক প্রকার অচেতন অবস্থা মাত্র। এ অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যে অবস্থায় আমার চৈতন্যই রহিল না, আমি বুঝিতেই পারিলাম না আমার প্রাণের মধ্যে কি হইতেছে, জানিতেই পারিলাম না আমার ইষ্ট দেবতা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছেন কি না,—তাহাকে যোগ বলি কিরূপে? আমি সচেতন থাকিয়া আমার প্রাণের দেবতাকে প্রাণের মধ্যে দেখিতে চাই, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চাই, তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিতে চাই, সমস্ত প্রাণ মন তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিতে চাই, সমস্ত শক্তির সহিত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চাই। আমি সজ্ঞানে আমার সমস্ত চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিতে চাই। ইহাকেই বলি যোগ। আর, যে উপায়ে এই অবস্থা লাভ করা যায়, তাহাকেই বলি যোগশাস্ত্র।

আধ্যাত্মিক সত্যলাভের পক্ষে, আত্মার উন্নতি সাধনের পক্ষে, চিন্তাই একমাত্র উপায়। চিন্তা হইতেই ভাবের উৎপত্তি এবং ভাব হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রার্থনার সহিত চিন্তার কিরূপ সম্বন্ধ, দেখা যাউক। অভাব-বোধ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা ব্যতীত প্রার্থনা হইতে পারে না। কিন্তু এই অভাববোধ প্রস্ফুটিত করিবার উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চিন্তাই অভাব-বোধ উৎপাদনের এক মাত্র উপায়। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে দেখান যাইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাইতে হইলে চিন্তা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। উপদেশ শ্রবণে বা পাঠে যে উপকার হয়, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অপরের প্রদত্ত উপদেশ আমাদের চিন্তাশক্তির সাহায্য করে বলিয়াই তাহা আমা-দিগের পক্ষে কার্য্যকাকারী হয়। যে উপদেশ আমার চিন্তাকে জাগ্রৎ করিয়া না দেয়, তাহা আমার পক্ষে কোনও কাজেই আসে না। নিদিধ্যাসন বা ধ্যান, চিন্তার প্রগাঢ়তম অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মননকে যদি কেবল 'চিন্তামাত্র' বলা যায়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনকে 'চিন্তাদ্বারা উপলব্ধি করা' বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর জগতের প্রত্যেক বস্তুকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা যদি আমি সাধারণ ভাবে চিন্তা করি, তবে তাহাকে মননের অবস্থা বলা যায়। কিন্তু সাধক যখন একাগ্রচিত্তে প্রাণের মধ্যে বা বহির্জগতে ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি কবিবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার আত্মার যে অবস্থা, তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি আধ্যা-

ত্মিক উন্নতিসাধনের যে কিছু উপায় আছে, চিন্তাই তাহার মূলমন্ত্র। চিন্তা ভিন্ন আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক পদও অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে প্রক্রিয়াদ্বারা এই চিন্তাশক্তির বিলোপ হয় এবং মন অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বলিব কিরূপে? এই চিন্তাহীন, নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে যিনি আধ্যাত্মিক যোগের অবস্থা বলিতে চাহেন বলুন, আমরা কিন্তু এ অবস্থাকে আধ্যাত্মিক নামে অভিহিত করিতেই প্রস্তুত নহি।

যে অবস্থায় আমাদের আত্মা পাপের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়; যে অবস্থায় আমরা প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি, 'প্রভু: আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'; যে অবস্থায় আমাদের সমস্ত চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হয়, তাহাই যথার্থ যোগের অবস্থা। যোগ শব্দের অর্থ আত্মার ক্রিয়াহীন, বিশ্রামের অবস্থা নহে; সহস্র কার্য্যের মধ্যে তন্ময় চিত্তে ঈশ্বরের দিকে আত্মাকে ফিরাইয়া রাখার নামই প্রকৃত আধ্যাত্মিক যোগ। কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে, সংসার ছাড়িয়া অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী না হইলে, জগতের সকল বিষয়ে উদাসীন না হইলে ধর্ম্মলাভ করা যায় না, ব্রাহ্মধর্ম্ম একথা স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; সংসারের প্রত্যেক বস্তুতে পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিতে হইবে; সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইয়া সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, পরমেশ্বরের সহিত আত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। যিনি প্রত্যেক বিষয়ে

ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া সংসারে বাস করেন; সকল অবস্থাতেই যাঁহার প্রাণ প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি নিয়ত সেই প্রাণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া থাকে; যিনি প্রাণের গভীরতম প্রদেশে ও বাহিরের প্রত্যেক বস্তুতে সর্ব্বক্ষণ পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হন; যাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ-স্রোত সেই সৌন্দর্য্য সাগরকে ছাড়িয়া অন্য কোনও দিকে প্রবাহিত হয় না; যাঁহার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও সেই পরম প্রভুর ইচ্ছাকে কখন অতিক্রম করে না; তিনিই প্রকৃত যোগী। তিনি সংসারী হইয়াও বৈরাগী, আবার বৈরাগী হইয়াও সংসারী। মৎস্য যেমন জলছাড়া হইয়া বাঁচিতে পারে না, তিনিও তেমনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। যিনি এই প্রকৃত আধ্যাত্মিক যোগের অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণ খুলিয়া প্রকৃতভাবে বলিতে পারেন,

"তোমারই নাথ! তোমারই চিরদিন আমি হে।"

জ্ঞানযোগ।

আমাদের মানসিক অবস্থা বা কার্য্য সকলকে বিশ্লিষ্ট করিলে তাহার মধ্যে তিনটী উপাদান (Elements) দেখিতে পাওয়া যায়;—(১) জ্ঞান (Knowing) (২) ভাব (Feeling) (৩) ইচ্ছা (Willing)। কার্য্যতঃ এই তিনটী উপাদানের কোনও একটীকে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। প্রত্যেক মানসিক অবস্থা ও কার্য্যেই এই তিনটী উপাদান অল্প বা অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা

এই তিনের পরস্পরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানব্যতীত ভাব হয় না, ভাব ব্যতীত ইচ্ছার উৎপত্তি অসম্ভব। তবে ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে কোনও অবস্থাকে বা জ্ঞানপ্রধান, কোনও অবস্থাকে বা ভাবপ্রধান, আবার কোনও অবস্থাকে বা ইচ্ছাপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যদিও জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেক মানসিক কার্য্য বা অবস্থার মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তথাপি চিন্তার সাহায্যের জন্য এই তিনটীর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিভাগ অনুসারে যোগের অবস্থাকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) জ্ঞানযোগ বা বিশ্বাস যোগ, (২) ভাবযোগ বা ভক্তিযোগ, (৩) ইচ্ছাযোগ বা কর্ম্মযোগ। কার্য্যতঃ এই তিনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যিনি জ্ঞানযোগ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, বিশ্বাস চক্ষে যিনি পরমেশ্বরকে সত্যরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, প্রেম ভক্তির স্রোত স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ, মহত্ত্বের প্রতি ভক্তি মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাহার প্রাণ আকৃষ্ট হয় না, সে সৌন্দর্য্য দেখে নাই। মহত্ত্ব দেখিয়াও যাহার ভক্তি না হয়, সে মানুষ নয়। ভালবাসা যদি সৌন্দর্য্যের অনুগামী হয়, তবে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার পরমেশ্বর অপেক্ষা অধিক প্রেমের পাত্র কে হইতে পারে? প্রেম যদি প্রেম আকর্ষণ করে, তবে সেই অনন্ত

প্রেমসাগর অপেক্ষা অধিক আকর্ষণ আর কাহার হইতে পারে? সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা যদি প্রেমের কারণ হয়, তবে সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আর কাহার দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে? উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা যদি মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক হয়, তবে তাঁহার ন্যায় উপকারী বন্ধু অপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র আর কে আছে? মহত্ত্বের যদি ভক্তি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে সেই অনন্তস্বরূপের দিকে না গিয়া মানুষের ভক্তি আর কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?

একদিকে যেমন প্রকৃত প্রেম ভক্তি প্রকৃত জ্ঞানের চির সহচর, অপরদিকে তেমনি প্রেমাস্পদের প্রিয়কার্য্য সাধন করা, আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা, প্রকৃত প্রেম ভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সংসারেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসে বা ভক্তি করে, সে সাধ্যমত তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এমন কি, প্রণয়ের অনুরোধে লোকে অনেক সময় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই দেখা যায় যাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহারা যতক্ষণ না আপনার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিতে পারেন, যতক্ষণ না আপনাকে সকল বিষয়ে তাঁহার দাস করিয়া ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রাণ কিছুতেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে দেখিবে জ্ঞান সত্ত্বেও ভক্তির অভাব রহিয়াছে, অথবা ভক্তি সত্ত্বেও সাধুভাব বা দাস্য ভাবের অভাব রহিয়াছে, সেখানে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, সে জ্ঞানের সঙ্গে কল্পনা বা অজ্ঞানতা, সে ভক্তির সঙ্গে অন্ধ

ভাবুকতা মিশ্রিত আছে। প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম ও প্রকৃত দাস্য পরস্পরের নিত্য সহচর। ইহার একটীর অভাব হইলে অপরগুলির মধ্যে কোনও প্রকার অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়া জানিতে হইবে।

যদিও জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তথাপি চিন্তা ও সাধনের সহায়তার জন্য এই তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা যাইতে পারে। এই জন্য আমরা আমাদের মানসিক অবস্থা ও কার্য্যের দার্শনিক বিভাগ অনুসারে যোগের অবস্থাকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা, বাহিরের প্রত্যেক বস্তুতে, জগতের ও জনসমাজের প্রত্যেক ঘটনায় ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করা, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা ইহাই জ্ঞানযোগের প্রধান লক্ষ্য। যে বিশ্বাস ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব, জ্ঞানযোগ দ্বারা সেই বিশ্বাস সমুজ্জ্বল হয়। এই জন্য জ্ঞানযোগ হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া ক্রমে যোগের উচ্চতর সোপানে উঠিতে হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন জ্ঞানযোগ সাধনের অন্য উপায় নাই। এস্থানে শ্রবণ অর্থে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ঈশ্বর কথা শ্রবণ করা অথবা ঐরূপ ব্যক্তিদিগের লিখিত উপদেশ পাঠ করা বা পাঠ শ্রবণ করা এই তিনই বুঝিতে হইবে। মনন অর্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করা; এবং নিদিধ্যাসন অর্থে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা। "শ্রুত

বা পঠিত বিষয় বুঝিবার জন্য মনঃসংযোগ ও চিন্তা বিশেষ আবশ্যক। আর মনন ও নিধিধ্যাসন চিন্তারই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা ও চিন্তা ভিন্ন জ্ঞানযোগ অসম্ভব। এই কারণে সাধনকালে যাহাতে অন্য কোনও চিন্তা আসিয়া সাধনের ব্যাঘাত না করে, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বাহিরের ব্যাঘাত দূর করিবার জন্য নির্জ্জন স্থান চাই। কিন্তু ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল না। বাহিরের বিঘ্ন অপেক্ষা ভিতরের বিঘ্নই অনেক স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতা করে। এমন কি, সৎকার্য্য সম্বন্ধীয় চিন্তা হইতেও সাধনের ব্যাঘাত উৎপাদিত হয়। ফলতঃ আমরা পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া যে কিছু চিন্তা বা কার্য্য করি, তাহাই আমাদের মনঃসমাধানের পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য ভিতরের বিঘ্ন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। নির্জ্জনে বসিয়া ধীর ও শান্তভাবে এমন সকল বিষয় চিন্তা করিতে হইবে যাহাতে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ চিন্তার সাহায্য হইতে পারে। প্রাকৃতিক শোভাসন্দর্শন, আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ, ব্রহ্মসঙ্গীত গান বা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময় চিত্ত সমাধানের সাহায্য হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম যাঁহার যে স্বরূপটী চিন্তা করিতে অধিক ভাল লাগে, তিনি তাহা লইয়া সাধন আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের চিন্তাকে কেবল সেই একটী স্বরূপে বদ্ধ করিয়া রাখিলে সাধন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে মনকে অন্যান্য স্বরূপ চিন্তনে নিযুক্ত করা অত্যাবশ্যক। এইরূপে আত্মার মধ্যে

যতই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে, ততই আমাদের প্রাণের অনুরাগ পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে, ততই ভক্তি-যোগের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে, ততই পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠিবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাই-তেছে যে, চিন্তাই যোগসাধনের একমাত্র পথ। যে জ্ঞান-যোগ আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথম সোপান, চিন্তা ব্যতীত কিছুতেই তাহাতে আরোহণ করা যায় না। সংসার ও রিপু-গণের কোলাহল হইতে অবসর লইয়া, ধীর, শান্ত, সংযত ও একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে; নানা কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার সত্তারূপ আলোকের মধ্যে বসিয়া কার্য্য করিতেছি, এই ভাবটী চিন্তাদ্বারা স্থায়িভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, আহারে বিহারে, গৃহে কার্য্যালয়ে, পথে ঘাটে, ক্রমাগত পরমেশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে তবে বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এই চিন্তার স্রোত যাহাতে অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা এবং যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই চিন্তার স্রোত অবরুদ্ধ হয়, তাহা সর্ব্ববিষয়ে পরিহার করা ঈশ্বরপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য।

ভক্তিযোগ

প্রকৃত বিশ্বাস ব্যতীত কখনই ভক্তি জন্মিতে পারে না। জ্ঞানযোগ দ্বারা বিশ্বাস সমুজ্জ্বল হইলে, পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিলে, ভক্তির উৎস আপনা আপনি খুলিয়া যায়। এই ভক্তি একবার জন্মিলে সাধনের কঠোরতা চলিয়া যায়, পাপ দূর করা সহজ হইয়া পড়ে, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়। ভক্তিই সংসারাসক্তির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আমরা স্বীকার করি যে, শুদ্ধ জ্ঞানালোক-দ্বারা সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসারাসক্তির হস্ত অতিক্রম করা, শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা রিপু দমন করা অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ সাধন অত্যন্ত কঠিন এবং সাধারণের পক্ষে এ সাধনে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। এ সংসারে প্রকৃত চিন্তাশীল লোক কয় জন পাওয়া যায়? আপনার উপর কয় জন লোকের তেমন কর্ত্তৃত্ব আছে? যে দিকে চাও দেখিবে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ নরনারী নদী-বক্ষঃস্থ তৃণের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেবল তাহাই নহে—যাঁহারা শুদ্ধ চিন্তাদ্বারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা শুদ্ধ চিত্তের দৃঢ়তাদ্বারা রিপুগণকে আপনাদের ইচ্ছাশক্তির অধীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যে সর্ব্বাবস্থায় ও সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন, কখনও কোনও কারণে যে

তাঁহাদের হৃদয়স্থিত জ্ঞানসূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইবে না, প্রবৃত্তির আকর্ষণ তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির উপর জয়লাভ করিবে না, এমন কথা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? পুরাকালের ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ যে বহুবৎসরব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যার পরেও প্রলোভনের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিতেন না বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহার কি কোনও অর্থ নাই? তাঁহাদের জীবন উজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিতেছে যে শুষ্ক চিন্তা বা চিত্তের দৃঢ়তাদ্বারা মানুষ সকল সময়ে সংসারাসক্তির হস্ত অতিক্রম করিতে পারে না, প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

জড় জগতে দেখা যায়, কোন একটী আকর্ষণের বলে যখন কোন পদার্থের একদিকে গতি হয়, তখন সেই পদার্থকে বিপরীত দিকে চালাইতে হইলে তদভিমুখে প্রথমোক্ত বল অপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। আধ্যাত্মিক জগতেও সেই রূপ। পশু ভাবের হস্ত অতিক্রম করিতে হইলে দেবভাব বর্দ্ধিত করা চাই; নীচ আসক্তি সমূহ দূর করিতে হইলে উচ্চতর বিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করা চাই; সংসারের প্রতি অনুরাগ দূর করিতে হইলে পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হওয়া চাই। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিনিচয়কে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কোন না কোন আকারে তাহারা প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। ভগবান্ শুকদেব সাংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও কৌপীনের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। কি পার্থিব, কি অপার্থিব সকল পদার্থের প্রতি অনুরাগশূন্য—এমন মনুষ্যের অস্তিত্ব সম্ভব

বলিয়া বোধ হয় না; এবং এরূপ জীবন সম্ভব হইলেও কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় মানুষ যতদিন বর্ত্তমান প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকিবে, ততদিন কোন না কোন বিষয়ের দিকে তাহার অনুরাগ ধাবিত হইবেই। যাহার উচ্চ বিষয়ে অনুরাগ নাই, তাহার চিত্ত নীচ বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে। এই জন্য নীচ প্রকৃতি দমন করিতে হইলে, উচ্চ বিষয়ে অনুরাগ স্থাপন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়।

এই অনুরাগ যখন পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় তখন ইহা ভক্তি বা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য সম্বন্ধেও 'ভক্তি' ও 'প্রেম' কথার ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে যে ভক্তিযোগের কথা বলিতেছি তাহা কেবল ঈশ্বরসম্বন্ধেই প্রযুজ্য। অনুরাগের যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমরা সংসারে দেখিতে পাই, ভগবদ্ভক্তি বা প্রেমের মধ্যেও সেই সকল লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক প্রেমের প্রধান লক্ষণ এই যে, যে যাহাকে ভাল বাসে সে সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিতে ও তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহার অদর্শনে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়, প্রেমাস্পদের নাম এবং তাহার সহিত যে কোনও পদার্থের অণুমাত্র সংস্রব আছে, তৎসমুদয় তাহার প্রিয় হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই ঘটিয়া থাকে। প্রাণের মধ্যে ইষ্ট দেবতার দর্শন ও সহবাস লাভের ইচ্ছা, বিবেককর্ণে তাঁহার সুমধুর ও জীবন্ত বাক্য শ্রবণের বাসনা, এবং সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ভগবদ্ভক্তির প্রধান লক্ষণ।

পরমেশ্বরের সহিত এই ভক্তিযোগ সংস্থাপিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বিশ্বাসদ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম এবং তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে হইবে; জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তাঁহার প্রেম, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতে হইবে; আমাদের প্রাণের সমস্ত অনুরাগ ক্রমে ক্রমে অন্য সকল পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রেম যখন পরমেশ্বরের মধ্য দিয়া বিশোধিত হইয়া আমাদের পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং পৃথিবীস্থ সকল নরনারী ও জীবজন্তুর উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের পবিত্র মন্দিররূপে, স্বর্গরূপে প্রতীয়মান হইবে। হৃদয় যখন এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখন আর অপবিত্রতা,সংসারাসক্তি ও মায়ামোহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি যোগ সাধনের জন্য নিজের অসারতা ও অযোগ্যতা ভাল করিয়া অনুভব করা আবশ্যক। আপনাকে অতি অকিঞ্চন জানিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে না পারিলে, প্রকৃতভাবে দীনাত্মা না হইলে ভক্তির উদ্রেক হয় না। জড় জগতে জল যেমন নিম্নগামী, জড়জগতে যেমন উচ্চভূমিতে জল দাঁড়ায় না, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ প্রেম নিম্নগামী, গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে প্রেমের জল, ভক্তির জল দাঁড়াইতে পারে না। যাহারা নিতান্ত দীনাত্মা, যাহারা নিজের অযোগ্যতা ও অসারতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, কেবল তাহাদের হৃদয়ই ঈশ্বরের প্রেমবারির উপযুক্ত আধার

তাহাদের হৃদয় শীঘ্র শুষ্ক হয় না। যে যত অধিক পরিমাণে নিজের হীনতা বুঝিতে পারে, যে যত অধিক পরিমাণে আপনাকে দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার প্রাণে ভক্তির জল তত অধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

নামসাধন ভক্তিযোগ স্থাপনের আর একটী প্রধান উপায়। পরমেশ্বরের যে নাম যাঁহার নিকট বিশেষ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, অনুরাগের সহিত সেই নামটী এমন ভাবে জপ করিতে হয়, যাহাতে নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিতে পারা যায়। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে মনের অবস্থা এমন হয় যে, সেই নামটী মনে হইবামাত্র অথবা শুনিবামাত্র প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। কিন্তু নামসাধন সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, পরমেশ্বরের নাম যেন কখনও বৃথা ও চিন্তাহীনভাবে উচ্চারণ করা না হয়। ইহাতে যে কেবল নাম সাধন বিফল হয়, তাহা নহে; পরন্তু হৃদয় অসাড় ও কঠিন হইয়া ভক্তিরসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মনন বা চিন্তাই ভক্তিযোগ সাধনের একমাত্র উপায়। পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম উপলব্ধি করাই বল, তাঁহার সহিত জীবাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করাই বল, নিজের অসারতা ও অযোগ্যতা উপলব্ধি করাই বল, আর নামের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপের যোগ স্থাপনের জন্য নাম সাধন করাই বল—সমস্তই চিন্তাসাপেক্ষ। সুতরাং যাহাতে এই চিন্তার কার্য্য অক্ষুণ্ণভাবে চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া

প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কোনও শারীরিক প্রক্রিয়াদ্বারা এই সকল মানসিক ব্যাপার কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

কেহ কেহ বলেন, হঠযোগ সাধন করিলে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদয় হয়। ইহাকেই তাঁহারা প্রেমানন্দ, যোগানন্দ মনে করেন। কিন্তু কথা এই, ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য আনন্দলাভ না ঈশ্বর লাভ? ঈশ্বরকে লাভ করিলে মনে আনন্দ সঞ্চার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আনন্দমাত্রেই কি যোগানন্দ? প্রত্যুত যে প্রক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আনন্দ উপলব্ধ হয়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, ঐ আনন্দ একপ্রকার শারীরিক অবস্থামাত্র। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার সহিত উহার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ আছে। আরাধনা ধ্যান প্রার্থনা-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ উপাসনার ভিতরে প্রবেশ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের বিবেচনায় অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক আনন্দ। এ স্থলে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না এই উপাসনা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কোনও প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়ার সহিত ইহার সংস্রব নাই।

কর্ম্মযোগ।

ভক্তিযোগপ্রভাবে যখন আমাদের প্রাণের অনুরাগ পরমেশ্বরের দিকে প্রবাহিত হয়, যখন আমাদের আত্মা তাঁহাকেই হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, যখন সেই প্রেমাস্পদকে দর্শন করা, তাঁহার বিষয় আলোচনা করা,

তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করাই আমাদের একমাত্র আনন্দের বিষয় হয়, তখন স্বভাবতঃই আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় পাপ করা একেবারে অসম্ভব হয়। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তখন সাধকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। যাহা কিছু ইহার বিরোধী, তাহা করিতে কখনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। মৎস্য যেমন জল বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে না, ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত সন্তানও সেইরূপ কি চিন্তায়, কি ভাবে, কি কার্য্যে, কিছুতেই সেই প্রাণাধার হইতে বিচ্যুত হইয়া এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সুতরাং যে কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী, যাহাতে সাধককে তাঁহার ইষ্টদেবতা হইতে বিচ্যুত করে, এরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা স্বপ্নেও তাঁহার মনে আসে না। তিনি যতদিন সংসারে বাস করেন, ততদিন কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার দিকে চাহিয়া, তাঁহারই অধীন হইয়া জীবনের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন; সকল কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দাস হইয়া জীবনব্যাপী উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার চিন্তা, ভাব ও কার্য্য নিমেষের জন্যও পরমেশ্বরকে অতিক্রম করে না। নিজের সুখ সম্পদ, মান অভিমান প্রভৃতি কিছুরই দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। ধর্ম্মপ্রচার হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের দৈনিক সামান্য কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার চক্ষে পবিত্র; কারণ, প্রত্যেক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশপালন ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনও লক্ষ্য নাই। কার্য্যের ফল কি হইবে তাহা দেখিবার

জন্য তিনি মুহূর্ত্তকালমাত্র ব্যস্ত হন না। তিনি আপনাকে ভুলিয়া ও কর্ম্মফলকামনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে নিযুক্ত থাকেন। তিনি আনন্দও চান না, দুঃখও কামনা করেন না। তিনি ঈশ্বরকে চান; প্রভু যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তিনি প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন। ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন; ইহারই নাম কর্ম্মযোগ। মানুষ যে মুহূর্ত্ত হইতে সকল বিষয়ে আপনার ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন করিতে চেষ্টা করে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার কর্ম্মযোগ-সাধন আরম্ভ হয়।

এই যে কর্ম্মযোগ, এই যে সকল কার্য্যে ঈশ্বরের অধীনতা, ইহাই চরম সাধন। এইখানেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগের পূর্ণতা হয় না,সেইরূপ কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয়ের একটীরও পূর্ণতা হয় না। যেখানে দেখা যায়, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে অসাধুতা একত্র অবস্থিতি করিতেছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, সে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, সে ভক্তির মূলে কুসংস্কার ও অন্ধ ভাবুকতা বর্ত্তমান আছে। যিনি প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া প্রবৃত্তির অধীনতা অবলম্বন করিতে পারেন না। এই জন্যই উপরে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগ-ব্যতীত সাধনের পূর্ণতা হয় না। সংসারে থাকিয়া পরমেশ্বরের আদেশ পালন করাই যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ,তখন কর্ম্মযোগ সাধন যে আমাদের জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত,

সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সংসারে আমাদিগকে যেরূপ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, বিশেষতঃ মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় জীবনের বহুবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে অনেকেরই যেরূপ অধিক সময় যায়, তাহাতে যে আমরা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কেবল কার্য্যের স্রোতে, অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া যাইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই জন্য সকল কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা অত্যাবশ্যক। এমন কি, ইহার অভাবে যে সকল কার্য্যকে আমরা সাধুকার্য্য বলিয়া মনে করি, তাহাও আমাদিগকে পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; প্রেমভক্তির পরিবর্ত্তে অপ্রেম শুষ্কতা আনয়ন করে; এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা নষ্ট করিয়া আমাদিগকে অবিশ্বাসের পথে লইয়া যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কার্য্যতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও ঈশ্বরাধীনতা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করে না। আমাদের জীবনে এই তিন সাধনের কার্য্যই একেবারে চলিতে থাকে, এবং ইহার প্রত্যেক সাধন অপর সাধনের সহায়তা করে। কোনও এক সময়ে ইহার মধ্যে একটী বা অপরটী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু সে সময়ে যে অবশিষ্টগুলির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে। একদিকে যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান লব্ধ হইলে ভক্তিভাব প্রস্ফুটিত হয়

এবং ভক্তি উন্নত হইলে আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হয়, অপর দিকে তেমনি ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া প্রাণপণে তাহা পালন করিবার চেষ্টা করিলে সেই সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উহা সাধন করিতে হইলে প্রার্থনাশীল চিত্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং এই সাধনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে চিন্তা ও সরল প্রার্থনার প্রয়োজন। প্রার্থনা প্রকৃতভাবে করিতে হইলে নিজের অভাব কি তাহা জানা এবং সেই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক। এতদুভয়ই চিন্তা-সাপেক্ষ। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মযোগ প্রকৃতরূপে সাধন করিতে হইলে চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন-ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া, অথবা অন্য কোনরূপ শারীরিক প্রক্রিয়াদ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ হঠযোগদ্বারা যে সমাধির অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে ত সমুদায় চিত্তবৃত্তির নিরোধবশতঃ চিন্তাশক্তির কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, কি কর্ম্মযোগ, কোন যোগই সাধন করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। আর এই জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ ভিন্ন যোগের যদি অন্য কোনও অর্থ থাকে, ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরের

স্বরূপ সম্বন্ধে উজ্জ্বল বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই প্রকৃত যোগ সাধনের একমাত্র উপায়। এ সমস্তই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। শরীরের সঙ্গে ইহার কোনও রূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। তবে মনঃসংযমের জন্য, চিত্ত সমাধানের জন্য যদি কোন প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা যোগ সাধনের একটী গৌণ উপায় হইতে পারে। কিন্তু তাহাকেই যোগ মনে করিলে, তাহাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিলে প্রকৃত চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হয় না।

ব্রাহ্মের সংসার পূজা।

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে থাকিতে রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাহার আকর্ষণ অতিক্রম করা, নানাপ্রকার সুখ ও বিলাসের সামগ্রী ভোগ করিবার উপায় সত্ত্বেও সুখলালসা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা, সংসারের ধন, মান, যশ ও প্রভুত্ব হস্তগত করিবার সুবিধা সত্ত্বেও তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকা যে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই যে, সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, এবং যথার্থ ধার্ম্মিক হইতে হইলে, পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসক হইতে হইলে, প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিতে হইবে, প্রলোভনের বস্তু সকলকে পবিত্র চক্ষে দেখিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার

স্বার্থপরতা, সুখলালসা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে ও সংসারের ধন মান প্রভৃতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ঈশ্বরের সেবায় জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। একমাত্র নিত্য সত্য পরমেশ্বরকে লাভ করা যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি কখনই সংসারের অনিত্য সুখ সম্ভ্রমে ভুলিয়া জীবন কাটাইতে পারেন না। হৃদয়ের অবিভক্ত অনুরাগ না দিলে কখনই সেই দেবদুর্লভ ধন লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম-রাজ্যে দুই দিক্ বজায় রাখিয়া চলা অসম্ভব। ঈশ্বরসেবা ও সংসারসেবা কখনই একত্র চলিতে পারে না। জীবনের অধিকাংশ সময় পরমেশ্বরকে ভুলিয়া সংসারে মগ্ন থাকিব, কেবল অবসর ও সুবিধা অনুসারে এক আধ বার তাঁহাকে ডাকিব, এরূপ করিলে জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হওয়া যায় না। এমন কেহ বোধ হয় আমাদের মধ্যে নাই, যিনি অন্ততঃ মুখে এ সকল কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় না যে আমরা কার্য্যতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উক্ত উপদেশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা যেরূপে জীবন কাটাইতেছি, তৎসম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমরা সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরমেশ্বরকে চাই না। আমরা সংসারও চাই, ঈশ্বরকেও চাই। সাংসারিক সুখের মায়া আমরা আজিও ভুলিতে পারি নাই। ধার্ম্মিক হইতে যে আমাদের সাধ যায় না, তাহা নহে; কিন্তু আমরা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য সাংসারিক সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন করিতে আজিও প্রস্তুত নহি। এ ভাবে ধর্ম্মসাধন

অসম্ভব। সংসারপূজা ও ঈশ্বরপূজা একত্র চলিতে পারে না। সমস্ত হৃদয় না দিলে কি কখনও দেবদুর্ল্লভ ঈশ্বরচরণ লাভ করা যায়? আমরা আমাদের হৃদয় ভাগ করিয়া তাহার অধিকাংশ সংসারকে দিতে চাই, অবশিষ্ট কিয়দংশ মাত্র ঈশ্বরকে দিতে চাই। বাহিরের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আমাদের যত ব্যস্ততা, প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তত ব্যস্ততা কৈ? বাহিরের গৃহ সাজাইতে আমাদের যত আগ্রহ, আত্মার গৃহ সাজাইতে তত আগ্রহ কৈ? এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ যাহাতে লোকের চক্ষে সুন্দর দেখায়, তাহার জন্য আমাদের যত ব্যগ্রতা, আমাদের অবিনাশী আত্মা যাহাতে ঈশ্বরের চক্ষে সুন্দর দেখায়, তাহার জন্য আমাদের তত ব্যগ্রতা কৈ? ঈশ্বর আমাদের নিত্যসঙ্গী, না সংসার আমাদের নিত্যসঙ্গী?

ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর বজায় রাখিয়া, সুবিধা ও অবসর অনুসারে একটু একটু ধর্ম্মসাধন, উৎসব প্রভৃতি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটু ভাবের উচ্ছ্বাস, আর অবশিষ্ট সমুদয় সময় আশ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া সংসারপূজা—ইহাই যেন আমাদের জীবনের স্থায়ী ভাব হইয়া উঠিতেছে। এ ভাবে যদি আর কিছুদিন চলে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই জীবনহীন ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্রে পরিণত হইবে। জীবন্ত বিশ্বাস ভক্তি ভিন্ন, পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গ ভিন্ন কখনই কোনও ধর্ম্মসমাজ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। সংসারপূজা দ্বারা সাংসারিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু অপর দিকে ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশেষ ভাব ও উপদেশ এই যে, জীবন্ত পরমেশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে হইবে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া,সুখে দুঃখে, পাপে তাপে, রোগে শোকে, সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিতে হইবে, তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু বলিয়া জানিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, প্রাণের অবিভক্ত অনুরাগভক্তি তাঁহার চরণে উপহার দিতে হইবে, তাঁহাকে আমাদের নিত্য সহচর ও অবলম্বন বলিয়া উজ্জ্বলভাবে অনুভব করিতে হইবে। যিনি তাহা পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের অধিকারী। নতুবা তোমার আমার ন্যায় ধর্ম্মাভিমানে বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া, কেবল মুখে উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিলে, শূন্য হৃদয় লইয়া ফাঁকা বক্তৃতা বা সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে গগণ পূর্ণ করিলে, সভা সমিতিতে গিয়া প্রতিপক্ষের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে নিপুণতা দেখাইতে পারিলে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অপরের চরিত্র বা মত লইয়া সমালোচনা করিতে পারিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না।

ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আমরা ধর্ম্মের সার কি পাইয়াছি? পরমেশ্বরকে আপনার করিতে কি পারিয়াছি? তাঁহার সহিত আত্মার নিত্য ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কি পারিয়াছি? তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমাদের মুখ এত মলিন কেন? তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমরা নিদ্রাভিভূতের ন্যায় অচেতনভাবে জীবন

কাটাইব কেন? তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে আজি আমরা তুচ্ছ শারীরিক সুখ লইয়া, সাংসারিক সুবিধা লইয়া, বাহিরের আড়ম্বর ও সাজ সজ্জা লইয়া এত ব্যস্ত থাকিব কেন? আর তাহাই যদি না পারিলাম, তবে আর আমাদের ব্রাহ্ম নামে অধিকার কি? যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি কি কখনও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিয়া, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া ধন, মান, প্রভুত্ব বা বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় তুচ্ছ সামগ্রী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারেন? অথচ যখন নিজের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন কি দেখিতে পাই? তখন দেখিতে পাই, আমরা অনেকেই কোন না কোন আকারে সংসারকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তাহারই পূজা করিতেছি; তখন দেখিতে পাই, আমরা সিংহ শাবক হইয়া শৃগালের দাসত্ব করিতেছি; তখন দেখিতে পাই, আমরা নানারাগরঞ্জিত একখণ্ড কাচের লোভে বহুমূল্য হীরককে অবহেলা করিতেছি; তখন দেখিতে পাই, আমরা দেবদুর্ল্লভ অধিকার লাভ করিয়া, স্বর্গরাজ্য হাতে পাইয়া নিজের বুদ্ধির দোষে তাহা হারাইতে বসিয়াছি। যদি আমরা ব্রাহ্ম নামের অধিকারী হইতে চাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করাই যদি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা যদি আমাদের যথার্থ অভিপ্রেত ও কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সংসারপূজা সম্পূর্ণরূপে পরি-ত্যাগ করিয়া, সুখ-লালসা ও বিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিয়া, মান অভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরের চরণে উপহার

দিতে হইবে; প্রাণের সিংহাসনে সেই প্রাণের দেবতাকে বসাইয়া ভক্তির সহিত নিত্য তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে; তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ও নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া তাঁহার সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহাই পরিত্রাণ, ইহাই স্বর্গ। যিনি ইহা জীবনে সাধন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। নতুবা তোমার আমার ন্যায় সংসারপূজক ব্রাহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে জগতের কোন লাভ নাই।

ব্রহ্মপরায়ণতা।

অনেক সময় এই চিন্তা আসিয়া মনকে আন্দোলিত করে যে, আমরা এত সাধন ভজন করিতেছি, তবু কেন আশানুরূপ ফল পাইতেছি না? প্রাণের মর্ম্মস্থান হইতে দেবতা জিজ্ঞাসা করেন, "বৎস, সাধ্যমত সাধন ভজন করিতেছ কি?" মনকে তখন কঠিন আত্মপরীক্ষার মধ্যে ফেলিলে দেখিতে পাই যে, দেবতার কথা সত্য, আমাদের কথা মিথ্যা। আমরা সাধ্যমত সাধন ভজন করি না। সাধন ভজন দূরে থাকুক আমাদের প্রাণে আজিও যথেষ্ট ব্যাকুলতা দেখিতে পাই না।

ব্রহ্মকৃপাবাদী কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা জীবের দুর্ব্বলতা প্রমাণ করিতে গিয়া জীব-চেষ্টার স্ফূরণের আবশ্যকতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের মতে জীব এক

প্রকার জড় বিশেষ, কেবল ব্রহ্মকৃপাবলে কার্য্যের স্ফূর্ত্তি হয়। ব্রহ্ম যে জীবের প্রাণ, ও ব্রহ্মসহায়তা ভিন্ন জীব যে ব্রহ্মের নিকটে পর্য্যন্ত আসিতে পারে না, এক দিকে এ কথাও যেমন ঠিক্, অপর দিকে ইহাও তেমনি জ্বলন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, যেখানে জীবের চেষ্টার সমাপ্তি সেইখানেই ব্রহ্মকৃপার আরম্ভ। নদীস্রোত কি কাহারও স্নানের জন্য তাহার বাটীতে জল আনিয়া দেয়? না, স্নানার্থীকে চেষ্টা করিয়া নদীতে যাইতে হয় ও তথায় গিয়া আপন শরীরকে নদীজলে অবগাহন করাইতে হয়? অনন্তকালস্থায়িত্ব ঈশ্বরের একটী গুণ; তাঁহার প্রকৃতি চপলার মত চঞ্চল নহে,—তাঁহার ইচ্ছা অখণ্ডনীয় ও স্থির; তাঁহার ইচ্ছা অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিকৃত। তাঁহার চরণ-নিঃসৃত করুণা-নদী অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র যেমন কাহারও কথা মানে না, শিশির বর্ষা যেমন কাহারও অনুরোধ শুনে না, তাঁহার করুণাও তেমনি কাহারও কথায় থামে না, কাহারও অনুরোধে বহে না, আপন মনে অনন্তকালকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জীব যতক্ষণ না সেই প্রবাহের মধ্যে আপনাকে ফেলিতে পারে, ততক্ষণ সে সেই কৃপাস্রোতের বীচিভঙ্গাঘাত সম্ভোগ করিতে পারে না। জীবের চেষ্টা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইলেই ব্রহ্মকৃপা বিকাশ পাইতে থাকে। অথচ এ কথাও সত্য যে, ব্রহ্মবল ভিন্ন জীব একটী পদও অগ্রসর হইতে পারে না। আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ ঠিক্ কোন্ স্থলে—ব্রহ্মশক্তির কার্য্যকারিত্বের আরম্ভ কোথায় ও আত্মশক্তির স্ফূরণের শেষ কোন্ স্থানে—ইহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

এখন, যেন মানিলাম তুমি চেষ্টা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-কৃপাবর্ত্তে ফেলিলে, তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল? ব্রহ্মকৃপা-স্রোত হইতে কি তুমি আপনাকে তুলিয়া সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পার না? সময়ে সময়ে শুভ মুহূর্ত্তে তোমার জীবন না হয় ধরণীতে স্বর্গধাম হইল, কিন্তু সময়ে সময়ে দুর্দ্দিনে তোমার জীবন যে নরক হইবে না, তাহা কে বলিল? সাময়িক যোগে তাই জীব অধিক দিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না। স্থায়ী যোগের লালসা শীঘ্রই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। নিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার ধর্ম্মজগতে তাই এত সম্মান। কি হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্র, কি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র, কি খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে নিষ্ঠার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া থাকে। ঈশ্বরসন্তান হইয়া, অনন্ত উন্নতিশীল আত্মা লইয়া তুমি কি পিতার অনন্ত-কালস্থায়িত্বের অনুকরণ করিতে শিখিবে না—তাঁহার সঙ্গে কেবল ক্রীড়া করিবে? এই স্থায়িযোগেচ্ছা ক্রমশঃ নিত্য দর্শন, নিত্য সম্ভোগ ও নিত্য সহবাস স্পৃহায় পরিণত হয়। মন শেষে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, আহূত হইবামাত্র প্রাণের দেবতা প্রাণে প্রকাশিত হন। কথিত আছে মহর্ষি নারদ ঈশ্বরকৃপায় এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

স্থায়িযোগস্পৃহার উপরে ব্রহ্মপরায়ণতার অবস্থান। এখানে আর মন এদিক্ ওদিক্ যাইতে পারে না, একেবারে ব্রহ্মের অধীন হইয়া পড়ে; লোকলজ্জা, লোকভয়ের অধিকার লুপ্ত হয়। সাধকের মনোভৃঙ্গ বিভু পাদপদ্ম হইতে দূরে যাইতে পারে না; কাছে কাছে ঘুরিতে থাকে। স্থায়িযোগস্পৃহার অবস্থায় বরং একদিন পতনের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম-

পরায়ণতার অবস্থায় পতনের দ্বার একবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। যে ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছে, সে অন্যদিকে চাহিবে কেন? যাহার মন বসে নাই সেই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া থাকে। ব্রহ্ম-পরায়ণের দৃষ্টি ব্রহ্মে সুদৃঢ়রূপে সংলগ্ন, তিনি ব্রহ্ম হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্তাস্তথা মতাঃ॥

সংসারের লোক জানে, যে যাহার পরায়ণ হয়, সে তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্মপরায়ণ তাই সংসারের কাছে সুপরিচিত। সংসার তাঁহাকে বিশ্বাস করে, তাঁহার কথায় সংসারের অশ্রদ্ধা হয় না। অল্পবিশ্বাসী ও তরল ধার্ম্মিকই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্ম ও সংসার দুই-দিক্ রাখিতে চেষ্টা করেন না। অথচ তিনি যেমন দুই-দিক্ রক্ষা করেন এমন সংসারী লোকে পারে না। সংসারে বাস করিয়াও তিনি সংসারের অতীত স্থান অধিকার করেন।

ব্রহ্ম লাভ করিতে যদি ইচ্ছা থাকে তবে আমাদিগকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। ব্রহ্ম অতি দুর্লভ পদার্থ। সংসা-রের প্রতি ষোল আনা টান বজায় রাখিয়া ব্রহ্মধন লাভ করিবার আশা দুরাশা মাত্র। প্রাণ যতদিন না ব্রহ্মপ্রবণ হয়, ততদিন জীবনে বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। একটু প্রতিকূল অবস্থায়, একটু শারীরিক অসুস্থতায় যে ধর্ম্ম-জীবন চঞ্চল হয়,সে ধর্ম্মজীবন লইয়া আমরা ব্রহ্মলাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া আমাদের পদে পদে এত দুর্দ্দশা। তাই আমরা না হইলাম সংসারপরায়ণ, না হইলাম ঈশ্বরপরা-

য়ণ। আত্মপরায়ণ হইয়া আপনারাই আপনাদের গম্য পথের প্রতিবন্ধক রচনা করিতেছি। সমগ্র প্রাণটী আপনার হাতে রাখিব, মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত সংসারের সুখ ভোগ করিব, আর সময়ে সময়ে ব্রহ্মরূপসাগরে নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিব, এ প্রবঞ্চনা ভগবানের কাছে খাটিবে কেন? আক্ষেপের বিষয় এই যে, সংসারের প্রকৃতি ও ব্রহ্মের স্বরূপ ভালরূপে জানিয়াও ব্রহ্মকরে প্রাণ সমর্পণ করিতে আমরা আজিও ইতস্ততঃ করিতেছি।

প্রেম সাধন।

এইজগতে নানা লোককে নানা ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমানপ্রবন্ধে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সৎকার্য্য সম্বন্ধে দেখিতে গেলে, কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াও কাজ করা যায়, আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগদ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য মনে করিয়াও কাজ করা যায়। কেহ বা লোকভয়ে অথবা পাঁচ জনের নিকট সুখ্যাতি পাইবার প্রত্যাশায় সৎপথে থাকে, অথবা সৎকার্য্য করা মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করিয়া সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আবার কেহ বা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করিতে চেষ্টা করে। লোকভয়ে বা প্রশংসার লোভে যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, আধ্যাত্মিক জগতে তাহার কোনও মূল্য নাই। যে লোকভয়ে সৎপথে থাকে, গোপনে সুবিধা পাইলে সে যে অসৎ কার্য্য

করিবে না, মনে মনে সে যে দুশ্চিন্তা পোষণ করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিবে না, এমন কথা বলা যায় না। এরূপ ব্যক্তি লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে সচ্চরিত্র ও সাধুভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নিকট, ঈশ্বরের নিকট তাহার এই দৃশ্যমান সাধুতা দাঁড়াইতে পারে না। আবার যিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যপালন, পরোপকার সাধন প্রভৃতি সাধুকার্য্যে নিযুক্ত হন, ধর্ম্মজগতে তাঁহার সেই নিরীশ্বর সাধুতাও আদর পায় না। সাধুতার প্রতি তাঁহার যে আস্থা, মানুষের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা, বিশেষ পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে তাহার হ্রাস হইতে পারে ; তেমন তেমন অবস্থায় পড়িলে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া পড়িতে পারে। তাঁহার সাধুতা যাহার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারে, এমন স্থায়ী ভিত্তি লাভ করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে।

ধর্ম্মজগতেও দুই প্রকারের সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহবা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করিয়া,কেবল বুদ্ধিগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিবেকানুমোদিত পথে চলেন, সকল সৎকার্য্যই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, বুদ্ধিদ্বারা মোটামুটি এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া, এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, এই ধারণা হৃদয়ে লইয়া, শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে জিতেন্দ্রিয় ও সাধু হইতে চেষ্টা করেন, আবার কেহ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রেমে এমন মুগ্ধ হইয়া যান যে, তাঁহার আপনার উপর আর কর্ত্তৃত্ব থাকে না, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা তাঁহার

পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, প্রাণপণে তাঁহার ইচ্ছা পালন করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। পরোক্ষভাবে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্যও লোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, আবার প্রেমের অনু-রোধেও আপনার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞানে প্রভুর চরণে উহা বলিদান দিতে পারে। কর্ত্তব্যের অনুরোধেও কষ্ট সহ্য করা যায়; আবার প্রেমের অনুরোধেও কষ্ট সহ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার সাধুতার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। কর্ত্তব্যের পথ শুষ্ক, প্রেমের পথ সরস; কর্ত্তব্যের পথ কঠিন, প্রেমের পথ সহজ। কর্ত্তব্যের মুখ সর্ব্বদা কঠোর ও রুক্ষ, তাঁহার প্রাণে কোমলতা নাই, তাঁহার ব্যবহারে মধুরতা নাই, তাঁহার কথায় রস নাই, তাঁহার জীবনে দীনতা নাই, তাঁহার ভ্রূ সর্ব্বদাই কুঞ্চিত, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি কোনও কঠোর ব্রত পালন করিতেছেন; প্রেমের মুখ সদাই প্রফুল্ল ও সহাস্য, তাঁহার প্রাণ সদাই সরস, ব্যবহার মধুর, কথা সুধা-বর্ষী, জীবন বিনয়ে মাখান; তিনি যখন প্রাণ দিতে যাইতে-ছেন, তখনও তাঁহার আনন্দপূর্ণ মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয় যেন কি সুখকর কার্য্য করিতে যাইতেছেন। ভালবাসার এমনই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, উহা কঠিন কার্য্যকেও সহজ করিয়া দেয়। যাঁহার প্রাণে ঈশ্বর-প্রীতি আছে, তিনি যত সহজে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তিনি যত সহজে ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, এমন কেহই পারে না। প্রেম-বিরহিত হইয়া শুদ্ধ মানসিক বল ও কঠোর সাধন-দ্বারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার; কিন্তু

প্রেম থাকিলে ধর্ম্মপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সহজে দূর করা যায়, ধর্ম্ম সাধনের কঠোরতা তিরোহিত হইয়া যায়। সংসার প্রেমিকের প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে না।

পাপের সহিত দুই প্রকারে সংগ্রাম করা যাইতে পারে। (১) পাপের প্রত্যেক প্রকাশের সহিত স্বতন্ত্র যুদ্ধ করা। সাধক জগতের অধিকাংশ লোকই এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত। ইহারা পাপের প্রত্যেক প্রকাশকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিয়া জয় করিবার চেষ্টা করেন, যত প্রকার উপায় আছে সমস্তই গ্রহণ করেন, এবং প্রবল সংগ্রামের পর হয়ত শত্রুকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন ইহারা একটী রিপুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকেন,অন্য দিকে অলক্ষিত ভাবে অন্যান্য রিপুদল মস্তক উত্তোলন করিয়া ইহাদের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করে। তখন ইহারা তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন,কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করিতে না করিতে আর এক দল শত্রু সমরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর সাধকেরা সর্ব্বদাই সশঙ্ক, চিন্তাকুল ও নিদ্রাশূন্য ; কুষীয় জারের ন্যায় ইহারা অহোরাত্র আপনাদিগকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য ইহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইহাদের সাধনের কিছুই ত্রুটি হয় না, বরং ইহাদের জীবনে সাধনের যত বাহুল্য, এত আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। পাপ কিন্তু রক্তবীজ ও রাবণের মত মরিয়াও মরে না। একবিন্দু রক্ত ভূমে পড়িবামাত্র শত রক্তবীজ সমরাঙ্গনে উদ্ভূত হয়। এক মুণ্ড কাটিবামাত্র সেইস্থানে নূতন মুণ্ড প্রকাশ পায়। একটী পাপ বিনাশ করিতে

না করিতে দশটা পাপ দেখা দেয়, সাধক পাপের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে করিতে ক্রমশঃই হতবল ও অবসন্ন হইয়া পড়েন।

(২) আর এক প্রকার সংগ্রাম আছে, তাহাতে পাপ চিরদিনের জন্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ সংগ্রামে সাধক পাপের প্রত্যেক বিকাশের সঙ্গে পৃথক্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না, অন্য প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। পাপ-বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না, যেখানে পাপের মূল সেখানে গিয়া উপস্থিত হন, এবং দূষিত মূল উৎপাটন করিয়া শাখাপ্রশাখাপত্রপুষ্পফলশোভিত পাপ তরু একেবারে বিনষ্ট করেন। রক্তবীজ ও রাবণের সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয় না, তিনি এরূপ এক মন্ত্র সাধন করেন, যাহাতে পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করিয়া তিনি ঐশী প্রেমসিন্ধু হইতে একবিন্দু প্রেম লাভ করেন। উহাতেই তিনি পাপের সুদৃঢ় মূল অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হন। ঐ প্রেমবিন্দুরই কিঞ্চিৎ তিনি আপন চক্ষে লাগাইয়া দেন, আর দিব্যচক্ষুশালী পার্থের ন্যায় বিশ্ব ব্রহ্মময় দেখেন, পাপ করিতে পারেন না। সকলেরই মুখে, সকল পদার্থে তিনি ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য দেখেন, ইষ্টদেবতার অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আঘ্রাণ করেন। নরনারীর মুখে যে স্বর্গ দর্শন করিল, তাহার ব্যভিচারের সম্ভাবনা কোথায়? উহার বলেই তিনি আত্মপরজ্ঞানের হস্ত হইতে চির মুক্তি লাভ করেন, সকলকে আপনার বলিয়া জানিতে পারিয়া সকল পাপ হইতে রক্ষা পান। সকলেই তাঁহার আপ-

নার, কাহার উপর তিনি ক্রোধ করিবেন? আপনার লোকের উপর কেহ কি রাগ করিতে পারে? কাজেই তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হয়। জগতে যাঁহার পর নাই, যিনি সকলের মিত্র, তিনি কাহাকে প্রবঞ্চনা করিবেন? কাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবেন? আপনাকে বা আপনার লোককে কেহ ঠকাইতে চায় না, আপনার টাকা আপনি কেহ চুরি করে না। আপনার সম্পত্তিতে আপনি কিরূপে লোভ করিবে? সুতরাং তাঁহাকে লোভ ত্যাগ করিতে হয়। বিন্দুমাত্র প্রেমের কি দুর্জ্জয় শক্তি! কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দুর্জ্জয় রিপু প্রেমের কাছে সহজেই পরাজিত হয়। প্রেমই প্রকৃত চিত্ত-সংযম ও ইন্দ্রিয়দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই দ্বিতীয় প্রকার সাধন অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। যত দিন আমরা উহা গ্রহণ না করিব, ততদিন আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর হইবে না। বনে গমন করিয়া দীর্ঘ কালব্যাপী শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের সময় অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে জীবন্ত বিশ্বাস ও প্রেম সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা বাহিরে বাহিরে সাধন করিব, ততদিন আমাদের উত্থান পতন ঘুচিবে না। সাধনের মুখ ভিতর দিকে ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। শত শত বৎসর যদি আমরা পাপের শাখাকর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকি, তথাপি সে কার্য্য ফুরাইবে না। শাখা ছাড়িয়া মূলে যাইতে হইবে। ব্রহ্মপ্রেমের এক বিন্দু তথায় ঢালিয়া দিতে হইবে, তবে আমরা নিস্তার পাইব। পাপের যদি সম্ভাবনাই রহিল, তবে আর কি সাধন করিলাম? আজি আমি ভাল আছি কালি

যদি বিপথে যাইবার আমার শক্তি রহিল, তবে আমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিব কিরূপে? প্রেমাস্ত্র ভিন্ন কিরূপে পাপের সম্ভাবনা নিরুদ্ধ হইবে? আর পাপের সম্ভাবনা যদি রহিত না হইল, তবে জীব কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? চিত্তের অংশ বা বৃত্তি বিশেষ সংযত করিলে কি হইবে? সমস্ত চিত্তের সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির মূলে আমাদিগকে গমন করিতে হইবে। সেখানে গেলে দেখিতে পাইব, যে একটা দুষ্ট "আমি" বসিয়া আছে, সে কিছুতেই মনে ব্রহ্মপ্রেমকে আসিতে দেয় না। ব্রহ্মপ্রেম কতই অনুনয় বিনয় করেন, স্বর্গের কতই প্রলোভন দেখান, কিন্তু সে 'আমি' টা ঘোর দুষ্ট, তাই সহজে তাঁহার কথায় ভিজে না। সে 'আমি'র চক্ষে জল নাই, প্রাণে কৃপা নাই, তাহার প্রকৃতি মরুভূমির মত খট্ খটে হইয়া রহিয়াছে। সে কেবলই লোকের দোষানুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী, আপনার দোষ ভুলিয়াও দেখিতে পায় না, আর যদি বা কখন পায় সে দোষ ক্ষালনের জন্য শত সহস্র ওজর বাহির করে। কিন্তু অন্যের বেলা তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগ্রৎ হইয়া উঠে। আপনার পক্ষে "শান্তি রস" এবং অন্যের পক্ষে "বীররস"। প্রার্থনা করিয়া পারি, কাঁদা কাটি করিয়া পারি, হত্যা দিয়া পারি, যেমন করিয়া পারি, এই দুষ্ট 'আমি'টাকে দমন করিতে হইবে, তাহার পর প্রবৃদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মকৃপা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাপের মূল তুলিয়া দিয়া যাইবে।

বহির্ম্মুখ সাধনের একটী অবশ্যম্ভাবী ফল সাধনাহঙ্কার। যদি মনে হয়, আমরা অনেক সাধন ভজন করিতেছি, তাহা

হইলে অমনি মনে হইবে, আমরা ভাল, আর যাহারা সাধন ভজন করিতেছে না, তাহারা মন্দ। কিন্তু যাঁহাদের সাধন অন্তর্মুখ, যাঁহাদের প্রাণে দুষ্ট 'আমি' নাই, যাঁহাদের চিত্তের মূলে প্রেম, তাঁহাদের মনে অহঙ্কার আসিতে পারে না। তাঁহারা যে সকল নিগূঢ়মন্ত্র সাধন করেন, তাহাতে আপন কর্তৃত্ব অনুভব করেন না। তাঁহারা নিজে সাধন করেন না, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সাধন করান। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তাঁহাদের প্রাণে এত উজ্জ্বল যে তাঁহারা অন্য কর্তৃত্ব বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরের দিকে তাঁহাদের স্থির দৃষ্টি, ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রাণটা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, সে দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। জগতের লোক সে পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত ও অবাক্ হয়, কিন্তু তাঁহারা সে দিকে দৃক্‌পাতও করেন না। আত্মাতে তাঁহারা সদাই পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি দেখিতে পান; জগতের সাধনাভাব দেখিয়া তাঁহাদের মনে তাই অহঙ্কার আসে না, জগতের হীনতা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা মর্ম্মপীড়িত হন। পিতার জগৎ, পিতার পরিবার তাঁহার ইচ্ছার মত নহে দেখিয়া তাঁহারা অস্থির হন। আপনার ভাই, আপনার ভগিনী যদি বিপথে যায়, তবে কে স্থির থাকিতে পারে? অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে অজস্র প্রেম তাঁহাদের উদার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া জগৎকে প্লাবিত করে। তাঁহাদের হৃদয়ে অহংই থাকে না, অহঙ্কার কিরূপে তিষ্ঠিবে?

যদি সহজে সংসারাসক্তি দূর করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়, পাপ অভ্যাস পরাস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রেমের পথ অবলম্বন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। জড়জগতে যেমন

দেখা যায়, কোন একটী আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যাইতে হইলে উক্ত আকর্ষণের বিপরীত দিকে তদপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক, ধর্ম্মজগতেও ঠিক্ সেইরূপ। নীচ আসক্তি সহজে দূর করিতে হইলে ঈশ্বরের প্রেমে যাহাতে প্রাণ আকৃষ্ট হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। এমন সহজ উপায় আর নাই। ভগবৎপ্রেমে একবার গা ভাসাইয়া দিতে পারিলে জীবনতরি এমন এক অনুকূল স্রোতের মুখে পড়িয়া যায় যে, তখন আর ধর্ম্মপথে চলা কঠিন বোধ হয় না। এই অবস্থায় ধর্ম্ম নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, সাধকের সমস্ত জীবন মধুময় হইয়া উঠে। যতদিন এই প্রেমরসে প্রাণ অভিষিক্ত না হয়, ততদিন ধর্ম্মসাধন কঠোর ও নীরস বোধ হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রেমের সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন।

উপরে যে প্রেমের কথা বলা হইল, তাহার সহিত পবিত্রতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যিনি প্রীতি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অপবিত্র কামনা হৃদয়ে পোষণ করা, সত্যস্বরূপকে যিনি ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অসত্যের সেবা করা, স্বর্গীয় রত্নে যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে তাঁহার পক্ষে বিষয় সুখের প্রতি লোভ করা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ, তাহা সুখপ্রদ হইলেও তিনি তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন; আবার যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়ী, তাহা কষ্টকর হইলেও তিনি তাহা আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করেন। যিনি যথার্থ প্রেমিক তিনিই প্রকৃত

বৈরাগী। ঈশ্বর-প্রেমে যাঁহার দৃষ্টি অনুরঞ্জিত হইয়াছে তিনিই সংসারকে যথার্থ প্রেমের চক্ষে দেখেন, অথচ সংসারের মায়া মোহ তাঁহার হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে না। এক সর্ব্বগ্রাসী ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার সমস্ত হৃদয়কে এমন অধিকার করিয়া বসে যে, কোনও প্রকার নীচ আসক্তি সেখানে স্থান পায় না। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণে এই প্রেমের সঞ্চার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রকৃত মধুরতা আস্বাদন করিতে পারা যায় না।

কিন্তু কি উপায়ে এই প্রেম আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে? মানুষের সম্বন্ধে দেখা যায় যে, সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, একত্র সহবাস, সৌন্দর্য্য বা ভালবাসাদ্বারা একহৃদয়ের প্রেম অপর হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাঁহার সহিত আমাদের খুব নিকট সম্বন্ধ, যিনি সর্ব্বদা আমাদের কাছে থাকেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য আছে, অথবা যিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে আমাদের অনুরাগ ধাবিত হয়। ঈশ্বরানুরাগ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথা খাটে। পরমেশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা আমরা যতই উপলব্ধি করিতে পারিব, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম যতই উজ্জ্বল ভাবে বুঝিতে পারিব, ততই আমাদের প্রাণের অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে যে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা-প্রণালীর অনুসরণ করা হয় তাহা এপক্ষে আমাদের একটী প্রধান সহায়। এমন মধুর, জীবনপ্রদ উপাসনাপদ্ধতি আর কোনও ধর্ম্মসমাজে নাই। এই উপাসনার ভিতর ডুবিতে পারিলে, আরাধনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ও সৌন্দর্য্যের

মধ্যে মগ্ন হইতে পারিলে, ধ্যানের মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ ও নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিলে, আপনাকে নিতান্ত অসার ও অযোগ্য জানিয়া দীনভাবে ব্যাকুল প্রার্থনা দ্বারা প্রাণের গভীর অভাব তাঁহাকে জানাইতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রেম সঞ্চারিত হইবে। এমন সুন্দর উপাসনা প্রণালীর অধিকারী হইয়াও যে এতদিন আমরা ধর্ম্মের সার ধন প্রেম হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত উপাসনা-প্রণালী আমরা জীবনে সাধন করিতে চেষ্টা করি না। প্রেম সম্বন্ধে দুইটী সহজ সত্য আছে; বিশ্বাস ও সাধনের অভাবে জীবনপ্রদ সত্য হইয়াও তাহা আমাদের নিকট মৃতবৎ রহিয়াছে। সে দুইটী সত্য এই— (১) সরলপ্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর পাপীর হৃদয়ে নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন, (২) ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইবেই। এই দুইটী সহজ সত্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক যদি আমরা পূর্ণাঙ্গ উপাসনা জীবনে সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে অচিরে আমাদের প্রেমের অভাব বিদূরিত হইয়া জীবন মধুময় হইবে।

ধর্ম্মজীবনে অধ্যবসায়।

সংসারের সকল বিষয়েই লোকে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। পরিশ্রম ভিন্ন মানুষ কোনও কার্য্যেই সফলকাম হইতে পারে না। অধ্যবসায় ভিন্ন কোন গুরুতর বিষয়ই সম্পন্ন হয় না। ধর্ম্মজীবন লাভ করা অপেক্ষা

মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর কার্য্য আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ বস্তু জগতে আর কি আছে? অথচ আমাদের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যেন ধর্ম্মজীবন অতি সহজলভ্য পদার্থ। আমরা ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করি না। অন্ততঃ আমাদের কার্য্য দেখিয়া ত সেরূপ মনে হয় না। বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত অনেকেই দৈনিক উপাসনা ব্যতীত ধর্ম্মলাভের জন্য আর কোনও বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন না। তাহাও আবার হয় ত অনেক সময় শুদ্ধ নিয়মরক্ষাতেই পর্য্যবসিত হয়। এই সকল লোক যে একেবারে ধর্ম্মপিপাসু নহেন তাহা নহে। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে তাঁহাদের মনে মনে সাধ আছে। তাঁহাদের জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় যে তাঁহারা বিশেষ সুখী বা সন্তুষ্ট নহেন তাহাও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এরূপ সাধে কোনও কাজ হয় না। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না। আজি আমার অবস্থা মন্দ আছে, কল্য নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিব আমার অবস্থা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনা অসম্ভব। রাতারাতি কেহ ধনী বা বিদ্বান্ হইতে পারে না। তবে রাতারাতি ধার্ম্মিক হওয়া সম্ভব মনে করিব কেন? ধর্ম্ম কি ধন ও বিদ্যা অপেক্ষা সুলভ পদার্থ? আপনার উপর জয় লাভ করা কি সহজ কথা? পরমেশ্বরের সহবাস কি পার্থিব সুখ সম্পদ অপেক্ষা সহজলভ্য?

মানবজীবনে অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনা যায় বটে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পাপীর মন ফিরিয়া যাইবার কথা শুনা

যায় বটে, কিন্তু তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ ইহা নহে যে দস্যু রত্নাকর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়া যায়, তাহার অর্থ ইহা নহে যে ঘোর পাতকী এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুদিগের সমকক্ষ হয়। এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের অর্থ এই যে, কখন কখন শুভ মুহূর্ত্তে মানুষের জীবনের গতি হঠাৎ ফিরিয়া যায়; এই একজন লোক বর্দ্ধমান গতিতে পাপের পথে চলিতেছিল, হঠাৎ কাহারও উপদেশ শুনিয়া বা অন্য কোনও কারণে তাহার চৈতন্য হইল, সে নিজের বিপদ্ বুঝিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহা তাহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ মাত্র। এই সময় হইতে তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল মাত্র। সাধুদিগের সমকক্ষ হইতে, দেব-ভাব লাভ করিতে তাহার এখনও অনেক দিন লাগিবে। অনেক চেষ্টা, অনেক সংগ্রাম, অনেক সাধনার পর তবে সে ঐ উচ্চ পদবী লাভ করিতে সমর্থ হইবে। রত্নাকরের জীবনের গতি এক মুহূর্ত্তে ফিরিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বহু কাল আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া রামনাম সাধন করিতে হইয়াছিল। বাল্মীকির জীবনের আখ্যায়িকা হইতে উপন্যাসের ভাগ ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে এই উপদেশই পাওয়া যায় যে, পরিশ্রম না করিলে,সাধন না করিলে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। সকল বিষয়েই আগ্রহ চাই, পরিশ্রম চাই, চেষ্টা চাই, অধ্যবসায় চাই। নতুবা কখনই কিছুতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। পরিশ্রম বিনা কেহ কখনও কোন গুরুতর

বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় নাই। বলপ্রয়োগব্যতীত কার্য্য হয় না—ইহা জড় জগতে যেমন সত্য, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি সত্য। ইহাই জগতের নিয়ম। ব্রাহ্মগণ কি জগতের বহির্ভূত যে তাঁহাদিগকে এই নিয়মের অধীন হইতে হইবে না?

ধর্ম্মজীবনে ধৈর্য্যশীলতার অভাব আমাদের হীনতার একটী প্রধান কারণ। সাধক ও আমাদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখিতে পাই যে, সাধক ব্রহ্মে লাগিয়া থাকেন, আমরা এক একবার আসিয়া লাগি, আবার চলিয়া যাই। আমরা সাধনাও করি, অথচ ধনমানের সেবা পরিত্যাগ করি না। সংসারের প্রতি আমাদের কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টি রহিয়াছে! সাধক কেবল সাধনা লইয়াই থাকেন। সাধনা তাঁহার ব্রত, সাধনা তাঁহার প্রাণ; সাধনা আমাদের সখ, সাধনা আমাদের খেয়াল। সাধক প্রাণপণে সাধনা ধরিয়া থাকেন, আমরা যতক্ষণ সাধন ভজন ভাল লাগে ততক্ষণই সাধন ভজন করি। মন ভাল আছে, উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও নাম জপের ঘটা পড়িয়া গেল। মন ভাল নাই, অমনি এমন হইয়া গেলাম, যেন জীবনে কখনও সাধন করি নাই; সব সাধন ভজন ছাড়িয়া দিলাম। সাধকের দৃষ্টি প্রভুর উপর। যদি তাঁহার জন্য তাঁহাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। কথিত আছে, যে নারায়ণ একবার দুই জন মহাতপা ঋষির ধৈর্য্যশীলতা পরীক্ষা করিতে আসেন। উভয়েই বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাঁহার তপস্যা করিতেছিলেন, নারায়ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আরও ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিলে আমাকে পাইবে।" বিষ্ণুর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া একজন

দীর্ঘকালব্যাপী পূর্ব্বকৃত তপস্যার পর ভবিষ্যতে আরও ষাট হাজার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে মনে করিয়া একেবারে নিরাশ হইলেন, এবং হা হতোঽস্মি বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। আর এক জন ঋষি ষাট হাজার বৎসর পরে নিশ্চয়ই দর্শন পাইবেন, দেবতার মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি তখনই দর্শন পাইলেন, কিন্তু যিনি নিরাশ হইয়াছিলেন তিনি দেবতার দর্শন পাইলেন না।

"হরিসে লাগি রহরে ভাই,
তেরা বনত বনত বনি যাই।"

এই মহাবাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম কেবল সাধকই বুঝিতে পারেন। সেই জন্য তিনি প্রভুর গৃহের দ্বারে সদাই মস্তক রক্ষা করেন। সহস্র অবস্থা ও ভাবের পরিবর্ত্তনে সেখান হইতে ক্ষণকালের জন্য মস্তক উত্তোলন করেন না, সুতরাং প্রভু স্বয়ং আসিয়া বড় যত্ন করিয়া, বড় আদর করিয়া তাঁহার সন্তপ্ত মস্তক অনন্ত প্রেমক্রোড়ে তুলিয়া লন ও আপন অলৌকিক রূপরাশি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার সকল দুঃখজ্বালা নিবারণ করেন। যিনি ব্রহ্মকে কখনও পরিত্যাগ করেন না, ব্রহ্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। তিনি ধর্ম্মের সেতু, তিনি ধর্ম্মের আবহ, তাঁহার ধৈর্য্যশীলতার ত্রুটি এপর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। আমরা তাঁহার কথা শুনিতেছি না, তাঁহার মতে চলিতেছি না, তাঁহার কোমল বক্ষে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছি, তথাপি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। কতকাল ধরিয়া

তাঁহাকে হৃদয়দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি, তিনি দাঁড়াইয়াই আছেন, তবু তাঁহার সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হয় না। আমরা আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিরাশ হই বটে, কিন্তু তিনি কখনও নিরাশ হন না। তাঁহার প্রেমচক্ষুর পলক পড়িতে কেহ দেখে নাই, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার বিন্দু মাত্র পরিবর্ত্তন কেহ কল্পনাতেও ভাবিতে পারে না। সাধক প্রাণপণে সাধ্য দেবতার অনুকরণ করেন; একবার যাহা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সহস্র বিঘ্নবাধার মধ্যেও তাহা ভগ্ন করেন না। একবার যাহা করিব বলিলেন, পৃথিবীর সমস্ত রাজশক্তি একীভূত হইলেও তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে না। প্রলোভন তাঁহার কাছে পরাস্ত, এবং পাপ তাঁহার কাছে ভীত। সংসার তাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি যদি মনে করেন যে প্রত্যহ উপাসনা করিবেন, প্রাণপণ করিয়া সেই ব্রত পালন করেন। দুই দিন উপাসনা ভাল লাগিল না বলিয়া তিনি উপাসনা ছাড়িয়া দেন না, দুই দিন সাধনবিশেষ কঠোর বোধ হইতেছে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন না। হাফেজ বলিয়াছেন, "যদি তোমার প্রতীক্ষা করিবার শক্তি থাকে, একদিন সহবাস লাভ করিতে পারিবে।" গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাতে নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। কি সংসারে, কি স্বর্গরাজ্যে চঞ্চলমতি অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের উন্নতি হওয়া দুর্ঘট। সংসারে যখন চঞ্চলতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তখন কোন্ সাহসে আমরা চঞ্চলতা লইয়া ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিবার দুরাশা করি? সত্যস্বরূপ, পরি-

বর্ত্তনবিহীন পরমেশ্বরের সাধক হইতে গেলে ধর্ম্মজীবন হইতে অসত্য, চঞ্চলতা, পরিবর্ত্তন জন্মের মত বিদায় করিয়া দিতে হইবে। প্রভুতে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে থাকিতে বনিয়া যাই-বেই যাইবে। তাঁহার সঙ্গে, পরিত্রাণের সঙ্গে পরিহাস করিলে চলিবে না, যাহা করিতে হয়, প্রভুর কাছে শুনিয়া লও, শুনিয়া তাহাতে প্রাণ মন ভাল করিয়া বাঁধ। সংসারের লোক কি দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই না ধনোপার্জ্জন করে! আর হতভাগ্য আমরা! আমরা কি আমাদের ইষ্টদেবতাকে লাভ করিবার জন্য তাহার চতুর্থাংশের একাংশ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইব না?

আগ্রহ ও অধ্যবসায় থাকিলে কি না হয়? অধ্যবসায়ের নিকট সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। অধ্যবসায়হীন ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও পরিণামে সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যবসায়শীল লোকের নিকট তাঁহাকে পরা-ভব স্বীকার করিতে হয়। অন্য বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম্ম জীবনে ঠিক্ সেইরূপ। এখানেও অধ্যবসায় ও পরিশ্রমই স্থায়ী উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। "সাধন বিনা সে ধন মিলে না"—ইহা একটি অভ্রান্ত সত্য। অধ্যবসায় থাকিলে নরকের মধ্যেও স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, মরুভূমিকে নন্দন কাননে পরিণত করা যায়। অধ্যবসায়ের বলে মহাপাতকীও পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারে। আমরা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলি, কিন্তু পরিশ্রমের নাম শুনিলেই পশ্চাৎপদ হই। তাই আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচে না। আমরা মুখে বলি, নিরাকার পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়, অথচ

আমাদের মধ্যে কয়জন লোক প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনার সময় তাঁহাদের ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন? কিন্তু আমাদের যদি তেমন অধ্যবসায় থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমরা পরমেশ্বরকে দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতাম। জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইয়াও আমাদের নির্জ্জীব ও শুষ্ক ভাব যায় না কেন? প্রেমময়ের উপাসক হইয়াও আমাদের মধ্যে অপ্রেম কেন? আনন্দস্বরূপের উপাসক হইয়াও আমাদের নিরানন্দ দূর হয় না কেন? পরমেশ্বরের দর্শন পাইলে সকল নির্জ্জীবতা, নিরুৎসাহ, শুষ্কতা, অপ্রেম ও নিরানন্দ চলিয়া যায়, পরমেশ্বরের দর্শন পাইলে কঠিন প্রাণ বিগলিত হয়, নীরস প্রাণে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়া যায়, একথা যদি সত্য হয়—তবে আর ভাবনা কি? পরমেশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক দেখি, কেমন তাঁহার দর্শন পাওয়া না যায়? আমাকে তাঁহার দেখা পাইতেই হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাক দেখি, কেমন তোমার উপর দিয়া তাঁহার কৃপাস্রোত প্রবাহিত না হয়? অধ্যবসায়শীল দীন ও সরল সাধকের নিকট পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন। আগ্রহের বলে, অধ্যবসায়ের বলে, পরিশ্রমের বলে ভগবানকেও বশীভূত করা যায়, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। একথায় একটুও ভুল নাই। অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর দেখি, দিন রাত্রির মধ্যে যখনই অবসর পাইবে তখনই প্রাণ খুলিয়া পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বল দেখি—

"তুমি তো কৃপা কল্পতরু। দেখা দিতে যে হবে হে, আমি অধম বলে দেখা দিতে যে হবে হে।"

—কেমন না তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়? আশার সহিত, বিশ্বাসের সহিত, অধ্যবসায়ের সহিত একথা বলিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ ঘুচিবে, নিশ্চয়ই আমাদের মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার হইবে, আমাদের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে, আমাদের অবনত মস্তক উন্নত হইবে, ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে।

কিন্তু এ সকলের মূলে বিশ্বাস চাই। পরমেশ্বরের কৃপায় বিশ্বাস চাই, প্রার্থনার সফলতায় বিশ্বাস চাই। আমাদের সে বিশ্বাস আছে কি?

ব্রহ্ম কৃপা।

বুদ্ধিগত সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিশ্বাসের প্রভাব জীবনের সমস্ত কার্য্যে পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু বুদ্ধিগত সংস্কার প্রাণের মূলদেশ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না, এই জন্য জীবনের কার্য্যের উপরও তাহার তাদৃশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ইতিপূর্ব্বে 'সজীব বিশ্বাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এই কথা বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একটী বিশেষ সত্য সম্বন্ধে এই কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইব। 'ব্রহ্মকৃপা'—এই কথাটী আমরা সময়ে, অসময়ে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে,

আমাদের পক্ষে উহা বুদ্ধিগত সংস্কারের কথা মাত্র ; ব্রহ্মকৃপায় প্রকৃত বিশ্বাস যাহাকে বলা যাইতে পারে, তাহা আমাদের নাই। আমাদের মধ্যে এই কথাটীর অত্যন্ত অপব্যবহার হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যে অবস্থায় ও যেভাবে সচরাচর অনেকে এই কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে মনে হয় যেন মানুষের চেষ্টার সহিত ব্রহ্মকৃপার কোনও সংস্রব নাই ; আমরা অলস ও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলেও ব্রহ্মকৃপাবলে স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাইব ; আমরা যে ভাবেই জীবন কাটাই না কেন, এমন একদিন আসিবে, যে দিন হঠাৎ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া দেখিব, আমরা আর সংসারে নাই, একেবারে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইয়াছি ; অথবা প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটী বিশেষ মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন হঠাৎ তাহার প্রাণ ব্রহ্মকৃপাবলে একেবারে জ্ঞানপ্রেম-পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। যদিও স্পষ্টতঃ আমরা একথা না বলি, তথাপি আমাদের ব্যবহার দেখিয়া, আমাদের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া, সাধনভজনে আমাদের অনাস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাদের মনের অতি গূঢ়তম প্রদেশে এই ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। কি আশ্চর্য্য ! এই পৃথিবীতে অতি সামান্য পদার্থ লাভ করিতে হইলেও বিনা পরিশ্রমে তাহা পাওয়া যায় না, এ কথা জানিয়াও আমরা বিনা পরিশ্রমে দেবদুর্ল্লভ স্বর্গীয় রত্নলাভের আশা করি ! বিদ্যা ও ধনসম্পত্তি লাভের জন্য মানুষ কতই না কষ্ট স্বীকার করে ! আর আমরা কি না সুখশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গরাজ্যে যাইব বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি ! পৌত্তলিক উপাসকগণ তাঁহাদের ইষ্টদেবতার

দর্শনলাভের জন্য কত তীর্থ পর্য্যটন, কত কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আর আমাদের দেবতা সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার বলিয়া আমরা মনে করি যে, দিনের মধ্যে এক আধবার চক্ষু বুজিয়া বসিলেই তাঁহার কৃপায় অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইব! ইহা অপেক্ষা গুরুতর ভ্রম আর কি হইতে পারে?

আমরা ইতিপূর্ব্বে 'ধর্ম্মজীবনে অধ্যবসায়' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছি, এবং এখনও সেই ভাবের পুনরুক্তি করিতেছি যে, বিনা পরিশ্রমে যেমন কোনও পার্থিব সামগ্রী লাভ করা যায় না, সেইরূপ বিনা পরিশ্রমে ধর্ম্মলাভও করা যায় না। কখন কখন কাহারও কাহারও জীবনে এমন শুভ মুহূর্ত্ত আসিতে দেখা যায় বটে, যখন তাহার মন, আপাততঃ দেখিতে অতি সামান্য এমন কোনও কারণে অকস্মাৎ সাংসারিকতা বা ঘোর পাপের পথ হইতে পুণ্যের দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু ইহাদ্বারা এরূপ বুঝা উচিত নহে যে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে নরকের কীট ছিল, পরমুহূর্ত্তেই সে পুণ্যের সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বর্গের দেবতা হইয়া যায়। ইহা নিতান্ত ভ্রমের কথা, কল্পনার কথা। ঐ সকল শুভমুহূর্ত্তে পাপীর মন পাপ হইতে পুণ্যের দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় মাত্র, ঐ সময় তাহার জীবনে পুণ্যের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হয় মাত্র। স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিবার, প্রকৃতপ্রস্তাবে পুণ্যবান্ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক চক্ষের জল ফেলিতে হইবে, বহুদিনের অভ্যস্ত পাপের সহিত অনেক যুদ্ধ করিতে হইবে। আর একটী কথা। পূর্ব্বে যে শুভ মুহূর্ত্তের কথা বলা হইয়াছে, অপর লোকের চক্ষে তাহা আকস্মিক বলিয়া

প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহাদের জীবনে ঐরূপ আপাত-দৃশ্যমান আকস্মিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাঁহাদের মন বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত হইতে থাকে, উক্ত পরিবর্ত্তনের অনুকূল চিন্তাস্রোত তাঁহাদের মনে পূর্ব্ব হইতেই প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ কোনও সামান্য ঘটনা উপলক্ষে জীবনে ঐ চিন্তা-স্রোতের কার্য্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়।

এক ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের পরিশ্রম করিবার যে শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে, অথবা যে সকল ঘটনা আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের অনুকূল চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া দেয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মকৃপা-লব্ধ। আমাদের ভিতর যে কিছু ভাল ভাব আছে, সে সকলই আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছি। আমাদের এই শরীর ও আত্মা যখন তাঁহারই প্রদত্ত, তখন আর অন্য বিষয়ের কথা কি? এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আমাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তিই যখন ঈশ্বরের কৃপা-সাপেক্ষ, তখন আর মানুষের চেষ্টার স্থল রহিল কোথায়?

যে অর্থে আমাদের যাহা কিছু আছে সকলই ব্রহ্মকৃপালব্ধ, আমরা প্রবন্ধের আরম্ভে যে ব্রহ্মকৃপার কথা বলিয়াছি তাহা ঠিক্ সেই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্রাহ্ম যখন মুক্তিসম্বন্ধে 'ব্রহ্মকৃপা' শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তাহার মধ্যে অন্য প্রকার একটু ভাব থাকে। সে ভাব এই যে, জীবের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের কৃপা ক্রমাগত প্রবাহিত হইতেছে। এই কৃপাপ্রবাহের মধ্যে যখন কেহ পড়িয়া যায়,

তখন তাহার জীবনের গতি একবারে ফিরিয়া যায়, সে ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়া অনুকূলবায়ু চালিত নৌকার ন্যায় সংসারের প্রতিকূল স্রোত সহজে অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে চলিয়া যায়। এ কথাটা ঠিক্; আধ্যাত্মিক জগতে এমন একটা অবস্থা কাহারও কাহারও জীবনে আসিতে দেখা যায়, যখন বলা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি নবজীবন লাভ করিয়াছে; আর সে মৃত্যুর রাজ্যে পাপের রাজ্যে, ফিরিয়া আসিবে না; এখন হইতে সে নিত্য উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবে; ঈশ্বরের কৃপার কার্য্য তাহার জীবনে আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাকে grace বা ব্রহ্মকৃপা লাভের অবস্থা বলে. হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে সিদ্ধের অবস্থা বলে। আধ্যাত্মিক জগতের এই নিগূঢ় সত্যটা সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস বা সংস্কার এই যে, এই ব্রহ্মকৃপা, এই grace সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই। ইহা কখন্ কাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়িবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ইহা যখন মনুষ্যের চেষ্টার অতীত পদার্থ, তখন আমরা চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, সাধন ভজন করিয়া কি করিব? তাহাতে কেবল অহঙ্কার বাড়িবে মাত্র। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। তাহার পর যখন তাঁহার কৃপা হইবার তখন হইবে। একথাটী সম্পূর্ণ সত্য নহে। এরূপ সংস্কার আধ্যাত্মিক আলস্যের পরিচায়ক মাত্র। ব্রহ্মকৃপা যে মানুষের চেষ্টার অতীত পদার্থ তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। এ কথাটী যেমন ঠিক্, তেমনি ইহাও ঠিক্ যে, মানুষের চেষ্টাব্যতীত ব্রহ্মকৃপা স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। পরমেশ্বর আমাদিগকে যে

ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা এই জন্য যে, আমরা তাহার পরিচালনাদ্বারা তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিব। এই চেষ্টাব্যতীত কখনই তাঁহার কৃপাস্রোত আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

বরফ যেমন আপনাকে আপনি গলাইতে পারে না, সেইরূপ মানুষ নিজে নিজের মুক্তিসাধন করিতে পারে না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাই বলিয়া যে মানুষের কিছু করিবার নাই তাহাও নহে। পরিত্রাণের জন্য 'আত্মপ্রভাব' ও 'দেব প্রসাদ' উভয়ই আবশ্যক। নদী ত প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি কি নদীর জল আপনা আপনি তাহার নিকট আসিবে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? পিপাসা নিবারণ করিতে হইলে তাহাকে জলের নিকট যাইবার পরিশ্রম টুকু স্বীকার করিতেই হইবে। সূর্য্যালোক যদি দেখিতে চাও, তবে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? যে অবস্থায় সূর্য্যালোক দেখা যায় আপনাকে সেই অবস্থায় ফেলিতে হইবে। বাতায়ন বন্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাকিলে কি সমীরণ সেখানে গিয়া তোমাকে শীতল করিবে? সেইরূপ যে ভাবে মনকে প্রস্তুত করিলে, যে অবস্থায় আপনাকে ফেলিতে পারিলে ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যায়, সেই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই অবস্থায় আপনাকে ফেলিতে হইবে। এবং তাহার জন্য পরিশ্রম করা চাই। ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে যে কোনও নিয়ম নাই তাহা নহে। কৃষক যেরূপ ভূমি কর্ষণ করিয়া বৃষ্টির প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপ মন প্রস্তুত করিয়া

ঈশ্বরের কৃপার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটু বিশেষ এই প্রভেদ আছে যে, কৃষকের পরিশ্রমের সহিত বৃষ্টির কোনও সম্বন্ধ নাই, কৃষক যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে বলিতে পারে না যে বৃষ্টি হইবেই; সে পরিশ্রম করিলেই যে বৃষ্টি হইবে এমন কোনও কথা নাই; বৃষ্টি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে সরল চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। সরল ও ব্যাকুল অন্তরে চেষ্টা করিলে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইবেই হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি তিনি কখনই মনে করিতে পারেন না যে, ঈশ্বর পাপার ক্রন্দন শুনেন না। ইহা ত ঘোর অবিশ্বাসের কথা। যিনি ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি এরূপ চিন্তাকে কখনই মনে স্থান দিতে পারেন না যে, সরল ও ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিলে তাঁহার কৃপা লাভ করা যায় না। যথার্থ সাধক যিনি তিনি কখনই মনে করেন না যে, তাঁহার নিজের চেষ্টার বলে তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, তিনি যদি সরলতা, আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করেন তাহা হইলে দয়াময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তবে কেন বলিব যে, ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই? যে অবস্থায় আপনাকে আনিলে ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যায়, সে অবস্থায় চিত্তকে অবস্থাপিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। এবং সেই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে মানুষের চেষ্টা-সাপেক্ষ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সে অবস্থা কি? সে অবস্থা ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। মানবাত্মা যখন আপনার দুর্ব্বলতা পরিষ্কাররূপে অনুভব করত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, তখনই তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হয়, তখনই সে নবজীবন লাভ করিয়া অনুকূলবায়ু-চালিত নৌকার ন্যায় সকল প্রতিকূল স্রোত সহজে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলমন্ত্র। ইহাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পুনর্ম্মিলনের অবস্থা। পরমেশ্বর মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন, এই পূর্ণ আত্মসমর্পণেই তাহা সর্ব্বোচ্চ সফলতা লাভ করে। যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া আপনাহইতেই জীবনের সমস্ত ভার তাঁহাকে দিতে পারে, নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীন হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অধীনতাই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের মুল। নতুবা বিশ্ববিধাতা যদি মানুষকে ইচ্ছাশক্তি-বিরহিত করিয়া, তাহাকে যন্ত্রের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে চালাইতেন, তাহা হইলে জড় পদার্থের সহিত তাহার বিশেষ কোনও প্রভেদ থাকিত না। এরূপ অধীনতার কোনও মূল্য নাই। মানুস যখন আপনা হইতে পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করে তখনই তাহার প্রাণে ব্রহ্মকৃপাঅবতীর্ণ হয়। ইহারই জন্য মানুষের নিজের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্যই সাধু মহাত্মারা বলিয়াছেন, 'যেখানে

মানুষের চেষ্টার পরিসমাপ্তি, সেইখানেই ব্রহ্মকৃপার আরম্ভ'। একথার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যখনই মানুষ নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্ব্বলতা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঈশ্বরের উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সমর্থ হয়।

কে বলিল ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই? কে বলিল মানুষের চেষ্টাব্যতীত ঈশ্বরের কৃপা মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হয়? ইহা অলস মনের কল্পনা মাত্র। স্নেহময়ী বিশ্বজননী অমৃতপাত্র হস্তে লইয়া মানবাত্মার দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেমভরে আমাদিগকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য ডাকিতেছেন। তাঁহার মধুর আহ্বানধ্বনি অনেক সময় মনের অবস্থাবিশেষে বা বিশেষ ঘটনাসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের মোহ কোলাহল ভেদ করিয়া আমাদের আত্মার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে বিচলিত করে। প্রাণ তাহা শুনিয়া এক একবার তাঁহার কাছে যাইবে বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে ভাব কয়জনের জীবনে স্থায়ী হয়? ঈশ্বরের কৃপাস্রোত ত সকলের জন্যই প্রবাহিত হইতেছে, তবে সকলের জীবনে তাহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কেবল যে আপনাকে তাহার ভিতর ফেলিতে জানে সেই জীবনে ঐ কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; নতুবা আমাদের মত অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে মুখে 'ব্রহ্মকৃপা,' 'ব্রহ্মকৃপা' বলিতে পারিলেই যদি ব্রহ্মকৃপা লাভের অধিকারী হওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? যিনি ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে

পারেন, তিনিই ব্রহ্মকৃপালাভের অধিকারী হন। তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইবেই হইবে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই এই আত্মসমর্পণের ভিত্তিভূমি। ইহার পরিচালনা ব্যতীত ব্রহ্মকৃপার অধিকারী হওয়া অসম্ভব। এই ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার নামই নিজের চেষ্টা। যিনি নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নিতান্ত দীনভাবে আপনার জীবনের ভার ঈশ্বরের হস্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্পণ করিতে পারেন, নিজের কর্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সরলভাবে 'প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই দীনতাই প্রকৃত মহত্ত্বের সোপান, এই দুর্ব্বলতাবোধই দুর্জ্জয় ঐশী শক্তির উৎস, এই আত্মসমর্পণই ব্রহ্মকৃপা লাভের একমাত্র অনুকূল অবস্থা।

নিজের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই আত্মসমর্পণের ভাব মনে স্থান পায় না। যে আপনাকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া বুঝে নাই, যে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া আপনাকে অবিশ্বাস করিতে শিখে নাই, সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে কিরূপে? আপনার প্রতি অবিশ্বাস হইতেই নির্ভরের ভাব, আত্মসমর্পণের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এই জন্যই নিজের অসারতা বুঝিতে না পারিলে ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করিতে পারা যায় না। যাহার প্রাণে অহঙ্কারের ভাব যত প্রবল, সে ঈশ্বর-কৃপার অনুভূতি হইতে সেই পরিমাণে বঞ্চিত। পরমেশ্বর যে তাহাকে কৃপা করেন না তাহা নহে। তাঁহার চন্দ্র সূর্য্য যেমন ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে আলোক বিতরণ করিতেছে, তাঁহার মেঘ যেমন পাপী সাধু

সকলেরই জন্য বারিবর্ষণ করিতেছে, তাঁহার বায়ু যেমন সকলেরই জন্য প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার পৃথিবী যেমন সকলেরই আহারের জন্য শস্য উৎপাদন করিতেছে, সেইরূপ তাঁহার কৃপাস্রোত দিবানিশি সকলেরই জন্য প্রবাহিত হইতেছে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি অন্তরে বাহিরে সেই কৃপার কার্য্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই কৃপাস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেন। তিনিই মুক্তিপথের প্রকৃত পথিক, তিনিই অমৃত ধামের যাত্রী, তিনিই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। যে আপনাকে নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অসার জানিয়া একাগ্রমনে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে, যে আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞান ও দুর্ব্বল জানিয়া প্রভুর হস্তে নিজের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এবং সকল অবস্থাতেই প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারে, "প্রভু! আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," দয়াময় প্রভু তাহার মলিন মুখ উজ্জ্বল করেন, তাহার অবনতমস্তক উন্নত করেন, তাহার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাহার প্রাণে আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার করেন, তাহার মরুভূমিসদৃশ প্রাণে ভক্তিনদী প্রবাহিত ও প্রেমের কুসুম সকল প্রস্ফুটিত করেন। তাহার জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে নিজেই অবাক্ হইয়া যায়, লোকে ত আশ্চর্য্য হইবেই। এই দীনতাবোধই ব্রহ্মকৃপালাভের একমাত্র উপায়, এই দুর্ব্বলতাবোধ হইতেই প্রাণে নবজীবন সঞ্চার হয়, প্রেমভক্তির উৎস খুলিয়া যায়। এই জন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "দীনাত্মারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" যে আপনাকে বাস্তবিক নিতান্ত অস-

হায় বলিয়া অনুভব করত একান্তমনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, সে দয়াময় প্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। আর অতি কৃপাপাত্র দীন সেই ব্যক্তি যে নিজের গর্ব্বিত মস্তক উন্নত করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে চায়, যে নিজের জ্ঞান বা সাধুতার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণকে ঘৃণা বা উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করে, এবং ভাই ভগ্নীর প্রাণে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বর্গরাজ্যের দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ; এখানে ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু মদমত্ত হস্তী এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। গর্ব্বোন্নত মস্তক ও দর্পস্ফীত হৃদয় লইয়া কখনই সে সঙ্কীর্ণ দ্বার অতিক্রম করা যায় না। নিতান্ত কদাচারী মহাপাতকীও ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া পবিত্র ও ধন্য হইতে পারে, কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যদিকে সহস্র সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইলেও প্রেমময়ের প্রেমরসের আস্বাদন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যতদিন না তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ততদিন ঈশ্বরের সহিত তাহার আত্মার শুভ সম্মিলন অসম্ভব। দয়াময়ের আধ্যাত্মিক অন্নছত্রে চীরবাসধারী, গলিতকুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষুকেরও স্থান হয়, কিন্তু মহামূল্যপরিচ্ছদশোভিত দিক্‌পালগণ সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন না। ভিক্ষুকের মেলায় ভিক্ষুকেরই প্রবেশাধিকার আছে, যে ভিক্ষুক নয় তাহার সেখানে যাইবার অধিকার কি?

প্রেমময়ের গৃহে নিত্য প্রেমোৎসব হইতেছে, নিত্য কত দীন হীন ভিখারী তাঁহার দ্বারে গিয়া প্রতিদিনের সম্বল করিয়া লইতেছে! কত লোককে হয়ত দয়াময় চিরজীবনের সম্বল

করিয়া দিতেছেন। কিন্তু কাঙ্গালী হইতে না পারিলে সেখানে গিয়া কোনও লাভ নাই। নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিতান্ত দীনভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে না পারিলে নিরাশ মনে ও শূন্যহস্তে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। শুদ্ধ বাহিরে দীনের বেশ পরিধান করিলে হয় না, শুদ্ধ বাহিরে ভিক্ষুকের ন্যায় কাতরতা দেখাইলে হয় না, শুদ্ধ মুখে আপনাকে কাঙ্গাল বলিলে হয় না। সংসারের কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে মানুষ যখন কাঙ্গালী বিদায় করে, তখন যাহারা বাস্তবিক কাঙ্গালী নয় এমন কত লোক তাহাদের দলে মিশিয়া দাতাদিগকে প্রতারিত করে। এখানে সে প্রবঞ্চনা চলে না। সেই অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে বাহিরের অশ্রুজল, বাহিরের ক্রন্দন, চীৎকার ও কাতরতাদ্বারা কে ভুলাইতে পারে? আপনাকে যথার্থ অসহায়, কাঙ্গাল বলিয়া অনুভব করিতে না পারিলে তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। যে নিজের দরিদ্রতা যত অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারে, তাহাকেই তিনি তত অধিক পরিমাণে প্রেমান্ন ও পবিত্রতার বসন বিতরণ করেন। যিনি জীবনের স্থায়ী সম্বল লাভ করিতে চান, তাঁহাকে নিজের অযোগ্যতা ও দরিদ্রতা বিশেষরূপে অনুভব করিতে হইবে। নতুবা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে অথবা অন্যের ভাবস্রোতের আঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য বিগলিত ও নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু সাময়িক আনন্দ ব্যতীত জীবনের কোনও স্থায়ী উপকার হয় না। হৃদয়নিহিত গূঢ় অহঙ্কারের বীজ বিনষ্ট না হইলে, সঙ্কীর্ত্তনেই উন্মত্ত হও, আর অশ্রুজলে ধরাতলই সিক্ত কর, দুই দিন

পরে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইবে না। এই অহঙ্কারই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, এই অহঙ্কারই আমাদের সমস্ত অপ্রেম, অসদ্ভাবের আকর। এই অহঙ্কারের জন্যই আমরা জীবন্ত ও সরস ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়াও শুষ্ক ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছি; দিনের পর দিন, উপাসনার পর উপাসনা, উৎসবের পর উৎসব কাটিয়া যাইতেছে, তথাপি আমাদের প্রাণে স্থায়ী ওজ্জ্বলন্ত বিশ্বাসের বিশেষ লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে, নিজের অযোগ্যতা ভাল করিয়া অনুভব করিতে না পারিলে, কখনই আমরা ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না; এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভিন্ন কেহ কখনও ঈশ্বরের কৃপা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। যিনি প্রেমময়ের প্রেমস্রোত হৃদয়ে ভাল করিয়া ধরিতে চান, যিনি রাজরাজেশ্বরের দানসাগরে উপস্থিত হইয়া স্থায়ী সম্বল লাভ করিতে চান, তাঁহাকে নিজের অযোগ্যতা ও দরিদ্রতা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে হইবে। নিজের অভাব ও মলিনতা বেশ করিয়া বুঝিয়া দীন হীন ভিক্ষুকের ভাবে, মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর দ্বারস্থ হইতে না পারিলে কখনই আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইব না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে আপনাকে যত ছোট মনে করে, দয়াময় তাহাকে তত উচ্চস্থান প্রদান করেন; আর যে আপনাকে যত বড় মনে করে, তাহার সেই পরিমাণে অধোগতি হয়।

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদের প্রকৃত ছবি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত করুন, আমাদিগকে নিজ নিজ অযোগ্যতা, মলিনতা ও দরিদ্রতা প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে সমর্থ করুন। আমরা যেন যথার্থ দীনভাবে তাঁহার দ্বারস্থ হইতে পারি।

সমাপ্ত।